সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ২০ মে ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৩৩-৩৪

www.weeklyarafat.com

যমযম কূপ

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ
যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ৩৩-৩৪
✱ বার : সোমবার

◈ ২০ মে-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৬ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ১১ যিলক্বদ-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **কুরবানীর উৎপত্তি, উপাদান ও কতিপয় বিধান**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ- ০৪
- ✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **কুরবানীর পশু কেমন হওয়া উচিত**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ১২
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **যিলহাজ্জ মাস : গুরুত্ব, প্রথম দশকের ফযীলত ও করণীয় 'আমল**
    আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ- ১৬
- ✍ **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী
    প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক- ২১
- ✍ **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **হাবীল কাবীলের কুরবানী**
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৪
- ✍ **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৬
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আমাদের কী করা দরকার?**
    এম এ মতিন- ২৮
- ✍ **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় শতভাগ পাস-ফেল করা প্রতিষ্ঠানের পেছনে থাকতে পারে যে সব কারণ**
    মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম- ৩২
- ✍ **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিম্নমুখী অবস্থান : প্রতিকারে প্রস্তাবনা**
    প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ৩৬
- ✍ **কবিতা** ৩৮
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- ✍ **শুব্বান সংবাদ** ৪১
- ☐ **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৪২
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৩-৩৪ সংখ্যা ❖ ২০ মে- ২০২৪ ঈ. ❖ ১১ যিলক্বদ- ১৪৪৫ হি.

সম্পাদকীয়

‘লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক’-এ কোন্ নিনাদ

আমি যথাযথভাবে তোমার দরবারে হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির! তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির, নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, সর্বপ্রকার নিয়ামত এবং রাজত্ব কেবল তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই। মহান আল্লাহর ঘর কা‘বা যিয়ারতকারীগণ নির্ধারিত স্থান হতে এভাবে তাওহীদের নিনাদ ঘোষণা করেন। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এ স্থানগুলোকে মীকাত বলা হয়। ‘উমরাহ্ ও হজ্জকারীগণ নিজ নিজ মীকাত হতে নিয়ত করে ‘উমরাহ্ ও হজ্জে প্রবেশের ঘোষণা দেন। নির্ধারিত মীকাত হতে নিয়ত করা, মহান আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ ও মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছাঁটার মাধ্যমে যে ‘ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া হয়, তাকে ‘উমরাহ্ বলে। এটি বছরের যে কোনো সময় করা যায়। এর জন্য কোনো নির্ধারিত সময় নেই। তবে রমাযান মাসে ‘উমরাহ্ করলে একটি হজ্জের নেকী পাওয়া যায়। আর হজ্জের মাস ও দিন-তারিখ নির্ধারিত। রমাযানের পরেই আসে শাওয়াল মাস। আর তখন থেকেই শুরু হয় হজ্জের গণনা ক্ষণ। শাওয়াল, যুলক্বা‘দাহ ও যুলহিজ্জাহ হচ্ছে হজ্জের মাস। আর মূল আনুষ্ঠানিকতা বা হজ্জের আসল পর্ব শুরু হয় ৮ যিলহাজ্জ তারিখে এবং শেষ হয় ১৩ যিলহাজ্জ তথা আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন। ইহরাম তথা হজ্জের নিয়ত, তাওয়াফ, সা‘ঈ, মীনায় রাত্রি যাপন, আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন, যামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও বিদায়ী তাওয়াফ-এর মাধ্যমে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে। তাওহীদের বাক্য হচ্ছে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ বা মা‘বূদ নেই। আর রিসালাতের বাক্য “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অর্থাৎ- মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। উভয়বিধ বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে সর্বপ্রকার ‘ইবাদত কেবল মহান আল্লাহর জন্য নিবেদন করা এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ত্বরীকায় এসব ‘ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া। আল্লাহ তা‘আলা জিন্ ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ‘ইবাদতের জন্য। আর ‘ইবাদতের মূল হলো মহান আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদ নিশ্চিত করা। ইসলামে প্রবেশ করে যখন মানুষ সালাত, যাকাত ও সিয়াম আদায় করে, তখন সে পরতে পরতে মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়। এভাবে যখন একজন মানুষ তাওহীদ বুঝতে সক্ষম হয় এবং মহান আল্লাহর ঘর কা‘বায় পৌঁছার সামর্থ্য পায়, তখনই তার উপর ইসলামের পঞ্চম রুকন হজ্জ ফরয হয়। আর হজ্জের প্রতিটি কাজ-কর্ম তথা আনুষ্ঠানিকতার মূল হচ্ছে মহান আল্লাহর যিক্র। সেজন্য হজ্জের মূল প্রতিপাদ্য বাক্য হচ্ছে “লাব্বায়িকা, আল্লা-হুম্মা লাব্বায়িকা, লা-শরীকা লাকা, লাব্বয়িকা, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্কা, লা-শরীকা লাকা।” বান্দা মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিনয়-নম্রতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পূর্ণ বিনয়াবনত হয়ে মহান আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের ঘোষণা দেয়।

হজ্জের মহামিলনে মিলিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে তাওহীদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম নর-নারী। তাঁরা সমাজের সচেতন ও বিত্তবান নাগরিক। প্রবেশ করে মহান আল্লাহর ঘর কা‘বায় তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে এবং হজ্জের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন শেষে আবার বাইতুল্লাহ চূড়ান্ত অঙ্গীকার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এক দেশের মুসলিম অপর দেশের মুসলিম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে। ফলে তাদের মধ্যকার তাওহীদী বন্ধন মজবুত হয়। বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে ঐক্যের মহাসম্মিলন সাধিত হয়। আর এ ঐক্য কোনো ভাষা, বর্ণ বা সংস্কৃতির নয়; বরং তা নিখাদ তাওহীদের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য। এ ঐক্যই মানুষকে নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। এটিই মুসলিমের প্রকৃত ঐক্য। এটাকে বলে ‘আক্বীদাহ্’ ও ‘মানহায’-এর ঐক্য। যেখানে এ মর্মে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটবে। আর এটাই মহান আল্লাহর একান্ত চাওয়া। অপরদিকে হজ্জ শেষে স্বদেশে ফিরে সমাজ সচেতন এসব সৎ, নিষ্ঠাবান ও আল্লাহভীরু মানুষেরাই সমাজ পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখলে সমাজ থেকে শির্ক ও বিদআতের মূলোৎপাটিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। তাওদীদের ভিত্তিমূলে গড়ে উঠবে আদর্শ ইসলামী সমাজ। আর এটাই হোক হজ্জের সফলতার বিশেষ ফলক! ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৩-৩৪ সংখ্যা ❖ ২০ মে- ২০২৪ ঈ. ❖ ১১ যিলক্বদ- ১৪৪৫ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

কুরবানীর উৎপত্তি, উপাদান ও কতিপয় বিধান

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَاتۡلُ عَلَیۡهِمۡ نَبَاَ ابۡنَیۡ اٰدَمَ بِالۡحَقِّ ۘ اِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنۡ اَحَدِهِمَا وَ لَمۡ یُتَقَبَّلۡ مِنَ الۡاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقۡتُلَنَّکَ ؕ قَالَ اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الۡمُتَّقِیۡنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"আর তুমি তাদের কাছে যথাযথভাবে আদমের দুই ছেলের বর্ণনা করো, যখন তারা দুইজনে কুরবানী পেশ করলো। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো আর অন্যজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো না। সে (যার কুরবানী কবুল হলো না) বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে (যার কুরবানী কবুল হয়েছিল) হত্যা করবো। সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকে (কুরবানী) গ্রহণ করেন।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

وَ-আর/এবং اُتۡلُ-তুমি বর্ণনা করো, عَلَیۡهِمۡ-তাদের কাছে, نَبَاَ-সংবাদ, ابۡنَیۡ اٰدَمَ-আদম সন্তানের, بِالۡحَقِّ-যথাযথভাবে/সঠিকভাবে, اِذۡ-যখন, قَرَّبَا-তারা দুইজনে নিকটবর্তী হলো, قُرۡبَانًا-কুরবানীর, فَتُقُبِّلَ-অতঃপর কবুল করা হয়েছিল, مِنۡ-হতে/থেকে, اَحَدِهِمَا-তাদের একজনের, وَ-আর/এবং, لَمۡ یُتَقَبَّلۡ-কবুল করা হয়নি, مِنَ-হতে/থেকে, الۡاٰخَرِ-অন্যজন, قَالَ-সে বলল, لَاَقۡتُلَنَّکَ-অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো, قَالَ-সে বলল, اِنَّمَا-নিশ্চয় যা, یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ-আল্লাহ কবুল করেন, مِنَ-হতে/থেকে, الۡمُتَّقِیۡنَ-মুত্তাকী/আল্লাহভীরু।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল মায়িদাহ্'র ২৭ নং আয়াত। সূরা আল মায়িদাহ্ কুরআনুল কারীমের পাঁচ নম্বর সূরা। এই সূরার ১৫ নং রুকূ'র ১১২ নং আয়াতে উল্লেখিত مَآئِدَةً শব্দটি থেকে এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ সূরার নামের মতো এই সূরার নামের সাথেও এর বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা করার জন্য একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণনার ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ সূরাটি একই সংগে নাযিল হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরির শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরির প্রথম দিকে সূরাটি নাযিল হয়। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা এর সত্যতা প্রমাণ করে। এই সূরায় মুসলমানদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিধি-বিধানসহ হজ্জ সফরের রীতি-নীতি ও পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল-হারামের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারিত হয়। এই সূরায় আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদানসহ ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি ও সাক্ষ্য প্রদানের আরো কয়েকটি ধারাসহ কসম ভাঙার কাফফারার বিষয়ে আলোচ্য সূরায় আলোচিত হয়।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿وَاتۡلُ عَلَیۡهِمۡ نَبَاَ ابۡنَیۡ اٰدَمَ بِالۡحَقِّ﴾

আদম (আলাইহিস সালাম) পুত্রদ্বয়ের ঘটনা তুমি তাদের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করো।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা তৎকালীন সময়ে মানুষের কাছে বিকৃতভাবে প্রচার হয়েছিল। কুরআন কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় যে, সে অতীতের কোনো ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করবে। তবে অতীতের কোনো বিকৃত ঘটনার প্রকৃতরূপ কিংবা যে ঘটনার মাঝে যতটুকুতে মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে মানুষের প্রয়োজনে ততটুকু ঘটনা কুরআন বর্ণনা করেছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনিটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে সমাজে প্রচলিত ঘটনাটির বিকৃতরূপ : বাইবেলের জেনেসিসের চার নম্বর অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলে সে গর্ভবতী হয় এবং তারপর তার গর্ভে কেইন (কাবিলের) জন্ম হয়। কেইন ছিল কৃষক। তখন সে বলল, খোদা আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছে। তারপর কেইন (কাবিলের) ভাই এবেলে (হাবিলের) জন্ম হয়। আর এই এবেল (হাবিল) ভেড়া-

---

** এমফিল গবেষক- জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

১ সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭।

বকরি চরাত। কেইন তার ভাই এবেলকে মাঠে নিয়ে হত্যা করে। এরফলে সদাপ্রভু তাকে বলে, তুমি যেই জমিই চাষ করো না কেন তাতে ফসল ফলবে না। তুমি পলাতক হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। তখন কেইন সদাপ্রভুর কাছে আরজ করলো- পৃথিবীতে যে আমাকে দেখবে সে আমাকে হত্যা করবে। তখন সদাপ্রভু বলল, পৃথিবীতে যে তোমাকে হত্যা করবে তার উপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এরপর সদাপ্রভু তার উপর একটি চিহ্নের ব্যবস্থা করে দেন যাতে মানুষজন তাকে চিনতে না পারে। তারপর সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাইবেলের এই বর্ণনাটি যথাযথ নয়। তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে– কাবিলকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সে এডেনের পূর্ব দিকে অবস্থিত নুদ অঞ্চলে বসবাস করে যাকে তারা 'কান্নীম' নামে চিনে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে দামেশকের উত্তর সীমান্তে কাসিউন পাহাড়ের সন্নিকটে একটি বধ্যভূমি রয়েছে। আগে এই স্থানটিকে মাগারাতুদ দাম বলা হয়ে থাকে সেখানেই কাবিল তার ভাই হবিলকে খুন করেছিল বলে কথিত আছে।

ঘটনাটির প্রকৃতরূপ : যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। যার কুরবানী কবুল হলো না সে বলল– আমি তোমাকে হত্যা করবই। অন্যজন বলল– আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যার জন্য আমার প্রতি তুমি হাত বাড়ালেও তোমাকে হত্য করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। আমি বিশ্বজাহানের প্রভু মহান আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করে জাহান্নামী হও আর এটাই যালিমদের কর্মফল। তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখানোর জন্য মাটি খুঁড়তে লাগলো। সে বলল হায়! আমি কি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।[২]

বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাবীল ও কাবীলের ঘটনা : হাবীল ও কাবীলের মধ্যে সুশ্রী বোনকে বিয়ে করার জন্য যে দ্বন্দ্ব হয় তারই যের ধরে তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার যে ঘটনা প্রচলিত আছে– কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের কোথাও সে ঘটনার অস্তিত্ব নেই। সেই ঘটনাটি এসেছে ইয়াহুদীদের কিংবদন্তী "Legends of the Jews"-এর Volume 1:3 থেকে। ধারণা করা হয়। ইহুদী পণ্ডিত কা'ব আল-আহবার (যে পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিল) তার থেকে ঘটনাটি নকল করা হয়েছে।

সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ কতিপয় সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সংগে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানের বিয়ে দিতেন। হাবীল সে মতে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে চাইলে কাবীল তা অস্বীকার করে সে তার যমজ বোনকে বিয়ে করতে চাইল। কারণ তার যমজ বোনটি ছিল অত্যাধিক রূপসী। আদম (আলাইহিস সালাম) হাবীলের সাথে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে দিতে চাইলে কাবীল তা অগ্রাহ্য করলো। ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) তাদের দু'জনকে কুরবানী করতে আদেশ করলেন।[৩]

ইমাম ইবনু কাসীর বলেন যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোনো কারণ বশে ছিল না বা কোনো নারীঘটিত বিষয় এর মধ্যে জড়িত ছিল না। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসাবশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু কাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি।[৪]

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ﴾

"তারা (আদমের দুই পুত্র হাবীল ও কাবীল) যখন কুরবানী পেশ করল তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো অন্যজনের কুরবানী গৃহীত হলো না।"

কাবীল (আদম [আলাইহিস সালাম]-এর বড়ো সন্তান) ছিল একজন কৃষক। সে কৃষি কাজ করত। কার্পণ্যের বশে সে তার উৎপাদিত নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের এক বোঝা শস্য কুরবানীর জন্য পেশ করলো। আর হাবীল ভেড়া-বকরি চরাত। মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় সে তার বকরির পাল হতে মোটা-তাজা ও পছন্দনীয় একটি ভেড়া/বকরি কুরবানী করলো।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত আগুন গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

[২] *সূরা আল মায়িদাহ : ২৭-৩১।*

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৭।*

[৪] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

আকাশ থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি গ্রাস করলো আর কাবীলের কুরবানীটি এমনিতেই পড়ে রইল। এতে বুঝা গেলো হাবীলের কুরবানী আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– হাবীলের কুরবানী দেওয়া এই পশুটিই পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানীর বিনিময় হিসেবে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়। আর ঐদিকে কাবীলের কুরবানী আগুন গ্রাস করেনি বলে বুঝা গেলো কবুল হয়নি। এতে কাবীল ক্ষুব্ধ হলো। তাই সে তার ভাই হাবীলকে লক্ষ্য করে বললো– لَأَقْتُلَنَّكَ, অর্থাৎ- আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।[৫]

﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"সে বলল– নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকী বান্দাদের কুরবানী কবুল করেন।"

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, তাক্বওয়া অর্জন কুরবানী কবুলের পূর্ব শর্ত। কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূলতঃ তাক্বওয়ার পরীক্ষাই নেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।"

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– আল্লাহর কসম! তাদের দুইজনের মধ্যে নিহত লোকটি-ই (অর্থাৎ- হাবীল) অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তারপরও সে তার ভাই কাবীলকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল– "নিশ্চয় আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। তারপরও যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবুও আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা, আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহকে ভয় করি।[৬]

কুরবানীর সংজ্ঞা : কুরবানী শব্দটি হিব্রু কুরবান (קרבן) আর সিরিয়াক ভাষার কুরবানা শব্দ দু'টির সংগে সম্পর্কিত। যার আরবি (قربانى) অর্থ কারো নিকটবর্তী হওয়া। ইংরেজি- Sacrifice শব্দটি ল্যাটিন স্যাক্রিফিকিয়াম, যা সাকার শব্দের সংমিশ্রণ। আর ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত قُرْبَانِيْ শব্দটি আরবি قرب মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে নৈকট্য। তাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীয়তসম্মত পন্থায় আদায়কৃত বান্দার যে কোনো 'আমলকে আভিধানিক দিক থেকে 'কুরবানী' বলা যেতে পারে। হোক সেটা যবেহকৃত বা অন্য কোনো দান-খয়রাত (ইমাম রাগিব)। তাফসিরে মাযহারীর বর্ণনা মতে, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নযর-মান্নতরূপে যা পেশ করা হয় তাকে বলা হয় 'কুরবানী'। ইমাম আবূ বক্র জাস্সাস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মহান আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কৃত প্রত্যেক নেক 'আমলকে 'কুরবান' বলা হয়। পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আশায় নির্দিষ্ট পশু যবেহ করাকে বলা হয় কুরবানী। কুরবানীর সমার্থক শব্দ 'উযহিয়া, 'নাহর' ও নুসুক ইত্যাদি।

কুরবানীর উৎপত্তি : ইসলামে কুরবানীর ইতিহাস বেশ প্রাচীন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল প্রথম কুরবানী পেশ করে। হাবীলই পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর জন্য একটি পশু কুরবানী করে। ইমাম ইবনু কাসীর বর্ণনা করেছেন যে, হাবীল একটি ভেড়া এবং তার ভাই কাবীল তার ফসলের কিছু অংশ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। আল্লাহ তা'আলা হাবীলের কুরবানী কবুল করেন। তারপর থেকে সকল নবীদের শরীয়তেই কুরবানীর বিধান দেওয়া হয়।[৭] তবে প্রত্যেক নবীদের সময়ে কুরবানীর পন্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সবশেষে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতি ও ভূখণ্ডের জন্য একই বিধান চলমান রয়েছে। যা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত শরীয়ত অর্থাৎ- কুরআন সুন্নাহর বিধান। আর এই সময়ে আমাদের উপর যে কুরবানীর পদ্ধতি চলমান তা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়ত থেকে এসেছে। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস থেকে জানা যায়। একদা সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছিলেন, কুরবানী কি? হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন– এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত।[৮] অর্থাৎ- আমাদের কুরবানী হলো মহান আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তদ্বীয় পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে সংঘটিত কুরবানীর চলমান পদ্ধতি। যার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে– কুরআনুল কারীমের সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত-এর ১০৫ থেকে ১০৮ নং আয়াতে।

[৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭।*
[৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭-২৮।*
[৭] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৪।*
[৮] *মুসনাদে আহমাদ; সুনান ইবনু মাজাহ্।*

কুরবানীর উপাদান : কুরবানী হলো ইসলামের একটি প্রতীক। যাকে শিয়ার বা মহান নিদর্শন বলা হয়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানীর জন্য নির্ধারিত আট প্রকারের পশু রয়েছে যাদের কোনো একটি দিয়ে কুরবানী করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ○ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আটটি মর্দা ও মাদী জন্তু। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। (হে রাসূল! যারা কোনো কোনো চতুষ্পদ জন্তুকে নিজেদের জন্য হারাম করেছে তাদের) জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় মর্দা কিংবা উভয় মাদি হারাম করেছেন? নাকি যা উভয় মাদির পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও এবং (তিনি তোমাদের জন্য হালাল করেছেন) উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। (তারপরও আপনি তাদের) জিজ্ঞেস করুন : তিনি কি উভয় মর্দা হারাম করেছেন, না উভয় মাদিকে? নাকি যা উভয় মাদির পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? কাজেই সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারি কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।"[৯]

কতিপয় বিধি-বিধান : মহান ত্যাগের উপাদানকে শ্রেণীবদ্ধ করার যে কোনো প্রচেষ্টা যদি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হলেও তা মহান স্রষ্টার জন্য উৎকৃষ্ট বিষয় ও বস্তুকেই একত্রিত করবে। উৎসর্গের শ্রেণীতে মৌলিকভাবে কুরবানী ও বিভিন্ন শব্দে তাক্বওয়া অর্জনের জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

ক. কুরবানী : মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যাকিছু মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় তাকেই বলা হয় কুরবানী। হতে পারে এটি কোনো পশুর জীবন কিংবা অন্য কোনো দান-সাদাক্বাহ্। যেমন- আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ছেলে হাবীলের জবাই করা পশু এবং কাবীলের উৎসর্গ করা এক বোঝা শস্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এই দু'টিকেই কুরবানী বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾

অর্থাৎ- "তারা দু'জনেই কুরবানী করল।"[১০]

কুরবানীর জন্য প্রস্তুতি : যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করে তার জন্য করণীয় হলো, যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত চুল-নখ ইত্যাদি না কাটা। হাদীসে এসেছে– উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

অর্থাৎ- তোমরা যদি যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানীর ইচ্ছা করে তবে সে যেন স্বীয় চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।[১১]

কুরবানী করার বিধান : কুরবানী করতে হবে ১০ যিলহাজ্জ ঈদের নামায আদায় করার পর থেকে ১২ কারো কারো মতে ১৩ যিলহাজ্জ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। কেউ যদি ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করে তাহলে তার জন্য বিধান হলো ঈদের নামাযের পর তাকে আরো একটি কুরবানী করতে হবে। যেমন- হাদীসে এসেছে–

مَن ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে কুরবানী করবে তাকে তার স্থলে (ঈদের নামাযের পর) আর একটি কুরবানী করতে হবে এবং যে (ঈদের নামাযের পূর্বে) কুরবানী করেনি (নামাযের পর) মহান আল্লাহর নামে তারও কুরবানী করা উচিত।[১২]

---

[৯] *সূরা আল আন'আম : ১৪৩-১৪৪।*

[১০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭।*

[১১] *সহীহ মুসলিম- হাদীস নং- ১৯৭৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২৩; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৭৯১।*

[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৮৫।*

খ. যবেহ : কুরবানীর জন্য নির্ধারিত দিন নির্ধারিত পশু কিংবা অন্য যে কোনো দিন যে কোনো বৈধ পশু মহান আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে যবেহ বলে। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে স্বপ্নে যবেহ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর শানেও এই যবেহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ﴾

অর্থাৎ- "সে (ইব্রাহীম [আলাইহিস সালাম]) বললেন, হে আমার বৎস! নিশ্চয়ই আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে যবেহ করছি।"[১৩]

যবেহ করার বিধান : যবেহ করার উপযুক্ত কোনো পশু-পাখি যবেহ করার সময় তার উপর অবশ্যই মহান আল্লাহর নাম নিতে হবে। তা নাহলে তা থেকে আহার করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ﴾

অর্থাৎ- "যবেহ করার সময় যে পশু-পাখির উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা আহার করো না। কেননা নিশ্চয় এটা গর্হিত বস্তু।"

আহলে কিতাবদের যবেহ করা পশু+প্রাণী খাওয়ার বিধান : আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিষ্টানগণ পশু-প্রাণী যবেহ করার সময় তার উপর মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তাই তাদের যবেহ করা পশু-প্রাণী আহার করা মুসলমানদের জন্যও হালাল তথা বৈধ।

গ. হাদী : হজ্জের অন্যতম বিধান হলো– পশু কুরবানী করা। আল-কুরআনুল কারীমে হজ্জে কুরবানী দেওয়ার জন্য পশুর বিশেষ বিশেষ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের একটি হলো "হাদী"। হজ্জের সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কুরবানীর জন্য যে সকল পশু হেরেম এলাকায় প্রেরণ করা হয় সে সকল পশুকে "হাদী" বলা হয়।

﴿فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ﴾

অর্থাৎ- "কিন্তু (হজ্জ ও 'উমরাহ্'র সফরে) তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে 'হাদী' (যা সহজ প্রাপ্য) তা উৎসর্গ করো। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না যতক্ষণ না 'হাদী' তার যথাস্থানে পৌঁছে।"[১৪]

[১৩] *সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত : ১০২।*
[১৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*

"হাদী" না থাকলে তার বিধান : যারা হজ্জে "হাদী" তথা পশু কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾

অর্থাৎ- "কিন্তু যার কাছে 'হাদী' তথা কুরবানীর পশু থাকবে না সে হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন রোযা রাখবে আর বাড়ী গিয়ে সাতদিন রোযা রাখবে এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ করবে।"[১৫]

ঘ. বুদন : অনুরূপ তাদের একটি নাম হলো "বুদন"। আরবি ভাষায় اَلْبُدْن শব্দটি بَدَنَة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ মোটা-তাজা দেহবিশিষ্ট পশু। কুরবানীর পশু সাধারণতঃ মোটা-তাজা হয় বলে তাকে بَدَنَة বলা হয়। শব্দটি শুধুমাত্র উটের জন্য ব্যবহার করা হয়।[১৬] আর হাজী সাহেবগণ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী দেওয়ার জন্য যে উট নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন তাকে "বুদন" বলা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾

অর্থাৎ- "আর কুরবানীর উট (বুদন)-কে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য এতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায় তাদেরকেও খেতে দাও।"[১৭]

বুদন শুধু উটের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আর হাদী হচ্ছে– উট, গরু, ছাগল সবগুলোর জন্য ব্যবহৃত নাম।[১৮]

গোশ্ত গ্রহণ ও তা বন্টনের বিধান : কুরবানীকৃত পশু বা যবাইকরা পশু-পাখির দেহ থেকে রক্ত বের হয়ে গিয়ে তা যখন নিস্তেজ হয়ে যায় এবং সে যখন প্রাণত্যাগ করে, তখন তা থেকে গোশ্ত গ্রহণ করতে হবে। নহর বা যবাই করার

[১৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*
[১৬] *তাফসীরে কুরতুবী।*
[১৭] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৬।*
[১৮] *তাফসীরে কুরতুবী।*

সাথে সাথেই গোশ্ত কাটা যাবে না। কারণ প্রাণত্যাগের পূর্ব জীবন্ত পশু-পাখির গোশ্ত কেটে খাওয়া নিষিদ্ধ। যেমন- নবীজি (ﷺ) বলেছেন–

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

অর্থাৎ- জীবিত অবস্থায় কোনো পশুর শরীর থেকে কেটে নেওয়া গোশ্ত মৃত প্রাণীর গোশ্তের ন্যায় নিষিদ্ধ তথা হারাম।[১৯]

কোনো কোনো উলামা মনে করেন কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া কুরবানীকারী ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ উলামার মতে কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া কুরবানীকারী ব্যক্তির জন্য জায়িয বা মুস্তাহাব। তাদের মতে কেউ যদি কুরবানীর গোশ্ত সম্পূর্ণ বিলি করে দেয় এবং একটুকরাও না খায় তাহলে তাতেও কোনো দোষ নেই। বিলি করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে قَانِع অর্থাৎ- ভিক্ষুক। এর অন্য একটি অর্থ অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি। তাই তারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও কারো কাছে কিছু চায় না। তারপর তাদের মাঝে বিলি করবে যারা اَلْمُعْتَرَّ অর্থাৎ- অভাবী এবং চেয়ে বেড়ায়। কেউ কেউ আবার সূরা আল হাজ্জ-এর, এই ৩৬ নং আয়াত থেকে দলিল নিয়ে পশুর গোশ্তকে তিনভাগ করা উচিত বলে উল্লেখ করেছেন, একভাগ নিজে খাওয়ার জন্য, দ্বিতীয় ভাগ অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ অভাবগ্রস্ত-ভিক্ষুকদের জন্য। কিন্তু সঠিক কথা হলো কোনো আয়াত বা হাদীস দ্বারা এ রকম দু'ভাগ বা তিন ভাগ করার কথা বুঝা যায় না; বরং সাধারণভাবে তা খাওয়া ও খাওয়ানোর কথাই বলা হয়েছে। অতএব এই সাধারণ নির্দেশকে সাধারণ রাখাই উচিত এবং ভাগাভাগির কোনো নিয়ম বেঁধে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্যই কুরবানীর চামড়ার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তা নিজে ব্যবহার করবে কিংবা সাদাক্বাহ্ করে দিবে। বিক্রি করে ভোগ করার অনুমতি নেই।[২০] তবে কিছু উলামা চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য গরিবদের মাঝে বন্টন করার অনুমতি দিয়েছেন।[২১]

ঙ. আযহা বা উযহিয়্যা : أَضْحَى শব্দটি একবচন। বহুবচনে أُضْحِيَاتٌ وَأَضَاحٍ অর্থ- ত্যাগ বা রক্ত প্রবাহিত করা। যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখে ত্যাগ বা রক্ত প্রবাহিত করা হয় বলে তাকে عِيْدُ الْأَضْحَى বলা হয়। পরিভাষায়- عِيْدُ الْأَضْحَى হলো–

عِيدٌ زَمانُهُ وَقْتَ أَدَاءِ مَناسِكِ الحَجِّ فِي اليَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ ذي الحِجَّةِ بَيْنَ ذِيْ القِعْدَةِ وَمُحَرَّم وَفِيْهِ يَنْحَرُ الْمُسلِمونَ الْأَضاحِي.

অর্থাৎ- ঈদুল আযহা হলো– যিলক্বদ, যিলহাজ্জ ও মুহর্‌রামের মাসে অনুষ্ঠিতব্য হজ্জের আচার-অনুষ্ঠান পালনের সময়কার এমন একটি দিন যা যিলহাজ্জ মাসের দশম দিন। যেখানে মুসলমানরা কুরবানী করে।

চ. নহর : نَحْرٌ শব্দের অর্থ উট কুরবানী করা। এর প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কুরবানী করার পদ্ধতি হচ্ছে জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালিতে ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। نَحْرٌ শব্দটি উটের সঙ্গে খাস। আরবে সাধারণতঃ উট কুরবানী করা হয় বলে কুরবানী বুঝাতে نَحْرٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে যে কোনো কুরবানীর অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

অর্থ : "অতএব আপনি আপনার প্রভুর জন্য সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।"[২২]

কুরবানী হলো আর্থিক 'ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী।[২৩]

ছ. 'আক্বীক্বাহ্ : 'আক্বীক্বাহ্ (আরবি- عَقِيْقَةٌ) হলো একটি নবজাতক শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে পশু কুরবানীর ইসলামিক ঐতিহ্য। এটি এক প্রকারের সাদাক্বাহ্। এটি মুসলিমসমাজে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। মুসলমান সন্তানের অভিভাবক সন্তানের মঙ্গলের জন্য পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল বা ভেড়া সামর্থ্য না থাকলে একটি ছাগল বা ভেড়া আর কন্যা শিশুর পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা ভেড়া 'আক্বীক্বাহ্ হিসেবে যবাই করে থাকে। এর গোশ্ত দিয়ে পরিবার ও বন্ধুদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন কিংবা গরিবদের মাঝে তা বিলি বন্টন করে থাকে। মাওয়ারদী বলেন, 'আক্বীক্বাহ্ বলা হয় ওই ছাগলকে ইসলাম পূর্বযুগে আরবরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যেই ছাগল যবাই করত। অলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন– জেনে রাখুন, প্রাক ইসলাম যুগেও আরবরা তাদের সন্তানের

[১৯] *সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : শিকার, হা. ২৮৫৮।*
[২০] *মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৫।*
[২১] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[২২] *সূরা আল কাওসার : ২।*
[২৩] *বাদায়িউত্ তাফসীর।*

'আক্বীক্বাহ্ করত। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা অব্যাহত রাখেন এবং মানুষকে এতে উদ্বুদ্ধ করেন।

'আক্বীক্বার বিধান : 'আক্বীক্বার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে নবী (ﷺ)-এর কর্ম ও উক্তি এই উভয়প্রকারের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে অনেক 'আসার' বর্ণিত হয়েছে। 'আক্বীক্বাহ্ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এর মাধ্যমে সন্তানকে বন্ধন মুক্ত করা হয়। তিনি বলেন–

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ اَوْمُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَابِع و يُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ.

অর্থাৎ- প্রত্যেক শিশু তার 'আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু কুরবানী করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়।[২৪]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন– "'আক্বীক্বার সাথে শিশু বন্ধক থাকে" একথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, যদি বাচ্চা 'আক্বীক্বাহ্ ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তাহলে সে তার পিতা-মাতার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে না। কেউ কেউ বলেছেন, 'আক্বীক্বাহ্ যে অবশ্যই করণীয় এবং অপরিহার্য বিষয় তা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' مُرْتَهَنٌ বা رَهِيْنَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকদাতার নিকট বন্ধকগ্রহিতা আবদ্ধ থাকে।[২৫] মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, এর অর্থ এটা হতে পারে যে, 'আক্বীক্বাহ্ বন্ধকী বস্তুর ন্যায়। যতক্ষণ তা ছাড়ানো না যায়, ততক্ষণ তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না।[২৬] শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করতে হবে। রাসূল (ﷺ) হাদীসে সপ্তম দিনের কথাই বলেছেন। অতএব সপ্তম দিনেই তা করা উচিত। তবে কেউ যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে তাহলে ১৪ দিনে করবে, না পারলে ২১ দিনে করবে। বড়ো হয়ে নিজে করার কোনো প্রয়োজন নেই। 'আক্বীক্বার জন্য নির্ধারিত পশু ভেড়া ও ছাগল।

একই পশুতে কুরবানীর শরীক ও 'আক্বীক্বার বিধান : আল-বুহুতি (রাহিমাহুল্লাহ) "শরহু মুনতাহাল ইরাদাত" গ্রন্থে (১/৬১৭) বলেন : যদি 'আক্বীক্বার সময় ও কুরবানীর সময় একত্রে পড়ে; অর্থাৎ- কুরবানীর দিনগুলোতে শিশুর জন্মের সপ্তম দিন বা অনুরূপ কোনো দিন পড়ে এবং তার 'আক্বীক্বাহ্ করা হয় তাহলে সেটা তার কুরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে। কিংবা যদি কুরবানী করা হয় তাহলে সেটা তার 'আক্বীক্বাহ্ হিসেবে যথেষ্ট হবে। যেমনিভাবে যদি ঈদ ও জুমা একই দিনে পড়ে তখন একটার জন্য গোসল করলে অপরটার জন্য সে গোসল যথেষ্ট হবে। ইমাম আহমদের উক্তির আলোকে 'কাশ্শাফুল ক্বিনা' গ্রন্থে (৩/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে; যদি 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানী একই সময়ে পড়ে এবং একটি পশু যবাই করার মাধ্যমে উভয়টির নিয়ত করা হয় তাহলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু 'আক্বীক্বার সময়ে যাদের 'আক্বীক্বাহ্ দেওয়া হয়নি কুরবানীর সময়ে একই পশুতে কুরবানী ও তাদের সে 'আক্বীক্বাহ্ বৈধ হবে কি-না এ মাসালায় আলেমগণের দু'টি অভিমত রয়েছে।

এক : দু'টি 'আমলের উদ্দেশ্য যেহেতু এক অর্থাৎ- পশু যবাই করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা। হাদীসেও কুরবানী এবং 'আক্বীক্বাহ্ দু'টোর ওপরই 'নুসুক' অর্থাৎ- কুরবানী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।[২৭] তাই একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমনিভাবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদে প্রবেশের নামায) ফর্‌য নামাযের মধ্যে সামিল হতে পারে। এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত। তাছাড়া এটি হাসান বসরি, মুহাম্মদ বিন সিরিন ও ক্বাতাদাহ্ প্রমুখেরও অভিমত।

দুই : 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানী উভয়টি সত্তাগতভাবে ভিন্ন উদ্দিষ্ট। এ কারণে একটি অপরটির পক্ষ থেকে জায়িয হবে না। তাছাড়া যেহেতু প্রত্যেকটির বিশেষ কারণ রয়েছে, আর সে কারণদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। হাইতামি 'তুহফাতুল মুহতাজ শারহুল মিনহাজ' গ্রন্থে (৯/৩৭১) বলেন : আমাদের মাযহাবের আলেমগণের উক্তির বাহ্যিক মর্ম হলো, যদি একটি ভেড়া দিয়ে কুরবানী ও 'আক্বীক্বার নিয়ত করা হয় তাহলে দু'টির কোনোটিই আদায় হবে না। যেহেতু দু'টির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য।

মোটকথা, 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানী দু'টি পৃথক 'ইবাদত। একই পশুতে কুরবানী ও 'আক্বীক্বাহ্ দু'টি একসাথে করার কোনো দলিল নেই। 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানী একই দিনে সম্ভব হলে দু'টিই করবে। নাহলে কেবল 'আক্বীক্বাহ্ করবে কেননা 'আক্বীক্বাহ্ জীবনে একবার হয় এবং তা সপ্তম দিনেই করতে হয়। কিন্তু কুরবানী প্রতিবছর করা যায়। কুরবানীর গরুতে 'আক্বীক্বার নিয়তে শরীক হওয়া যেমন নিষেধ নয়;

[২৪] *সুনান আবূ দাউদ; মুসনাদ আহমাদ; ইরওয়া- হা. ১১, ৬৫।*
[২৫] *নায়লুল আওত্বার- শাওকানী, অধ্যায় : 'আক্বীক্বাহ্, ৬/২৬০ পৃ.।*
[২৬] *মিরক্বাত শরহে মিশকাত- (দিল্লীর ছাপা) অনুচ্ছেদ : 'আক্বীক্বাহ্, ৮/১৫৬ পৃ.।*
[২৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৬৩।*

তেমন উত্তমও নয়।[২৮] প্রয়োজনে উট ও গরুতে শরীক হওয়া বৈধ হলেও উত্তম হলো– শরীক না হয়ে একাকি কুরবানী করা এবং উত্তম হলো– পুত্র সন্তান হলে দু'টি আর কন্যাসন্তান হলে একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ করা। কেননা, উম্মু কুরয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'আক্বীক্বাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ.

অর্থাৎ- পুত্রসন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর কন্যাসন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবাই করবে।[২৯]

জ. নুসুক : কুরআনুল কারীমে কুরবানীকে 'নুসুক' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "বলো, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।"[৩০]

হাদীসেও কুরবানী এবং 'আক্বীক্বাহ্ এ দু'টো বুঝাতে এদের ওপর 'নুসুক' অর্থাৎ- কুরবানী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।[৩১]

ঝ. নযর/মান্নত : মহান স্রষ্টার নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় যে কোনো 'ইবাদতের নযর বা মান্নত করা যায়। যেমন- কোনো মানুষকে কোনো সম্পদ দিয়ে দেওয়া, মাদ্‌রাসা ও মসজিদে দান করা, রোযা রাখা। কিংবা কোনো ইয়াতীমখানায় উট, গরু ও ছাগল দেওয়া ইত্যাদি।

মান্নত আদায়ের বিধান : কেউ যদি কোনো কিছু মান্নত করে তাহলে যতদ্রুত সম্ভব তাকে তার সে মান্নত পূর্ণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সে যা মান্নত করেছে রদ-বদল না করে হুবহু তাই তাকে আদায় করতে হবে। এমনকি সে যদি কোনোকিছুর শর্তে মান্নত করে থাকে। তাহলে তার সে শর্ত/চাওয়া পূর্ণ না হলেও তাকে তার কৃত মান্নত পূর্ণ করতে হবে।

ঞ. সাদাক্বাহ্ : মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি কেউ কুরবানী করে তাহলে সেটা তার পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

সাদাক্বার বিধান : সাদাক্বাহ্ করা পশুর গোশ্‌ত কুরবানীর পশুর গোশ্‌তের মতো নিজে খাওয়া যাবে না এবং আত্মীয়দের মধ্যে যারা সাদাক্বাহ্ খাওয়ার উপযুক্ত নয় তাদেরকেও খাওয়ানো যাবে না। এর সবটাই গরিব ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে।

কুরবানী কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত : শুধু কুরবানীই নয়; বরং প্রত্যেকটি 'ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত প্রধানত দু'টি। যথা-

(১) ইখলাস : কারো মনোরঞ্জন বা প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য নয় 'ইবাদতটি হবে স্রেফ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। মহান আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে তার সঙ্গে যাকে বলে তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।"[৩২]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে কুরবানী সংক্রান্ত শরীয়তের সকল নিয়মকানুন মেনে কুরবানী করা : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে কুরবানী সংক্রান্ত শরীয়তের সকল নিয়মকানুন মেনে কুরবানী করাতে হবে। তাহলেই কুরবানী কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের জন্য শিক্ষা

(১) আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর সময়েও কুরবানীর প্রচলন ছিল যার কারণে কাবীল ও হাবীল কুরবানী করেছে।

(২) কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যার কাহিনির মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্ররোচিত হওয়ার ও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

(৩) মুত্তাক্বী ব্যক্তিগণ কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা অন্যায় করেন না; বরং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন। মহান আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে মহান আল্লাহর পরীক্ষা মনে করেন এবং এতে ধৈর্য ধারণ করেন।

(৪) আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বিনয়ী ও মার্জিত আচরণের অধিকারী হয়।

(৫) আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাক্বীদের কর্মগুলোই কবুল করেন। ❑

---

[২৮] *রদ্দুল মুহতার- ৬/৩২৬।*
[২৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫১৬।*
[৩০] *সূরা আল আন'আম : ১৬২।*
[৩১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৬৩।*
[৩২] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

কুরবানীর পশু কেমন হওয়া উচিত

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ. فَقَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَأَصَابِعِيْ أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِيْ أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ : "أَرْبَعٌ لَا تَجُوْزُ فِي الْأَضَاحِيِّ- فَقَالَ : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِيْ لَا تَنْقَى". قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ : لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.

‘উবাইদ ইবনু ফাইরূয (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারা ইবনু ‘আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করি, কোন ধরনের পশু কুরবানী করা জায়িয নয়? তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়ান। আমার আঙ্গুলগুলো তাঁর আঙ্গুলের চেয়ে তুচ্ছ এবং আমার আঙ্গুলগুলের গিরাগুলো তাঁর আঙ্গুলের গিরার চেয়ে তুচ্ছ। তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, চার ধরনের দোষযুক্ত পশু কুরবানী করা জায়িয নয়। অন্ধ যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন-যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া-যার খোঁড়ামি সুস্পষ্ট, বৃদ্ধ ও দুর্বল-যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বলি, বয়সের কোনো দোষ থাকাও আমি অপছন্দ করি। আল-বারাআ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তুমি যা অপছন্দ করো তা বর্জন করবে, তবে অন্যের জন্য তা নিষিদ্ধ করবে না। আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এমন দুর্বল যে, তার হাড়ের মজ্জা নেই।[৩৩]

হাদীসের ব্যাখ্যা

উপরোক্ত দলিলের আলোকে এটা বুঝা যায় যে, বর্ণিত দোষ থেকে নিম্ন পর্যায়ের দোষ থাকলে তার কুরবানী বৈধ কিন্তু উত্তম নয়। যেমন- কান কাটা, শিং ভাঙ্গা, লেজ কাটা, চামড়া কাটা পশু। এমন দোষ থাকলে তা কুরবানীতে মাকরূহ। এরপরেও অনেককে দেখা যায়, স্পষ্ট খোঁড়া বা একেবারে বয়স্ক পশু কুরবানীর জন্য খরিদ করে কুরবানীর পশু ঐ সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া যেগুলোর কারণে কুরবানী আদায় হয় না; এমন ত্রুটি ৪টি :

১. চোখে স্পষ্ট ত্রুটি থাকা : যেমন- চোখ একেবারে কোটরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া কিংবা বোতামের মতো বের হয়ে থাকা কিংবা এমন সাদা হয়ে যাওয়া যে, সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, চোখে সমস্যা আছে।

২. সুস্পষ্ট রুগ্নতা : যে রোগের প্রতিক্রিয়া পশুর উপরে ফুটে ওঠে। যেমন- এমন জ্বর হওয়া যার ফলে পশু চরতে বের হয় না ও খাবারে তৃপ্তি পায় না। এমন চর্মরোগ যা পশুর গোশ্ত নষ্ট করে দেয় কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

৩. স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া : যার ফলে পশুর স্বাভাবিক হাঁটা-চলা ব্যাহত হয়।

৪. এমন জীর্ণ-শীর্ণতা : যা অস্তির মজ্জা নিঃশেষ করে দেয়। এ চারটি ত্রুটি থাকলে সে পশু দিয়ে কুরবানী দেয়া জায়িয হবে না। এ ত্রুটিগুলোর সমপর্যায়ের কিংবা এগুলোর চেয়ে মারাত্মক অন্য ত্রুটিসমূহকেও এ ত্রুটিগুলোর অধিভুক্ত করা হবে। সে রকম কিছু ত্রুটি নিম্নরূপ :

১. অন্ধ পশু; যে তার দুই চোখে কিছুই দেখে না। **২.** যে পশু তার সাধ্যের অতিরিক্ত খাবার খেয়েছে; যতক্ষণ না তার তরল পায়খানা হয়ে সে আশংকামুক্ত হয়। **৩.** যে পশু গর্ভবতী; কিন্তু পশুটি শংকার মধ্যে রয়েছে; যতক্ষণ না তার শংকা দূরীভূত হয়। **৪.** গলায় ফাঁস লেগে কিংবা উপর থেকে পড়ে যে পশু আহত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী যতক্ষণ না সে পশু শংকামুক্ত হয়। **৫.** যে পশু কোনো রোগজনিত কারণে হাঁটতে অক্ষম। **৬.** সামনের এক পা কিংবা পেছনের এক পা কর্তিত পশু।

এ ত্রুটিগুলো যদি হাদীসে উল্লেখিত ত্রুটিগুলোর সাথে একত্রিত করা হয় তাহলে সর্বমোট ১০টি ত্রুটি হবে; যেগুলোর কারণে কোনো পশুকে কুরবানী করা জায়িয হবে না। উল্লেখিত ৬টি এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৪টি।

কুরবানীর পশুর বয়স : হাদীসের শেষ অংশে কুরবানীর পশুর বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে আর তা হচ্ছে, উটের বয়স পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হওয়া, গরুর বয়স দুই বছর সম্পূর্ণ হওয়া, ছাগলের বয়স এক বছর সম্পূর্ণ হওয়া, মেষ বা দুম্বার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়া। এর কম বয়সের হলে তা কুরবানীতে যথেষ্ট হবে না। এর দলিল নবী (ﷺ)-এর হাদীস :

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৩৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮০২; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৪৯৭; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৩৬৯।*

لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

তোমরা দাঁতা পশু ব্যতীত অন্য কোনো পশু (কুরবানীতে) যবেহ করবে না। তবে যদি তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে তাহলে দুম্বা বা মেষের জায্'আ (যার বয়স ছয় মাস) যবেহ করবে।[৩৪] নবী (ﷺ) বলেন :

«لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

"তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠা (মুসিন্না) পশু ব্যতীত যবেহ করো না। তবে কষ্ট হলে ভেড়ার জাযআ তথা ছয়মাস বয়সের ভেড়া যবেহ করতে পারো।"[৩৫]

অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসিন্না তথা উট, গরু, ছাগলের নতুন দাঁত উঠা পর্যন্ত কুরবানীর জন্য উপযুক্ত হবে না। তবে কষ্টকর হলে ভেড়ার জাযআ বা ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যবেহ করা যাবে। নিম্নে বয়স ভেদে কুরবানীর জন্য উপযুক্ত পশুর তালিকা দেয়া হলো–

উপরোক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম নাওয়াভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "অত্র হাদীসে সুস্পষ্ট যে, ভেড়া ছাড়া অন্য কোনো পশুর জাযআ তথা ছয় মাসের বাচ্চা কুরবানী করা কোনো অবস্থাতেই জায়িয হবে না। কাজী ইয়াজের ভাষ্যমতে এ ব্যাপারে সমস্ত উলামা একমত। তবে আমাদের সাথীদের মধ্য হতে আবদারী প্রমুখ আওযাঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উট, গরু, বকরী, ভেড়া সব কিছুর জাযআহ্ দ্বারা কুরবানী হবে বলে মন্তব্য করেছেন। এটা 'আত্বা হতেও বর্ণিত। তবে ভেড়ার জাযআ সম্পর্কে আমাদের ও সমস্ত উলামাদের অভিমত এই যে, এটা কুরবানীতে চলবে- চাই অন্য পশু পাওয়া যাক বা না যাক। তাঁরা ইবনু 'উমার ও যুহরী প্রমুখ হতে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন : ভেড়ার জাযআও চলবে না। তাদের স্বপক্ষে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দলিলস্বরূপ নেয়া যেতে পারে।

তবে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন : হাদীসটির নির্দেশ ভেড়ার জাযআর ক্ষেত্রে মোস্তাহাবের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ- উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যামূলক ভাষা এই হবে, তোমাদের জন্য মুস্তাহাব হলো : তোমরা মুসিন্না ব্যতীত অন্য পশু দ্বারা যবেহ করবে না। তবে যদি তা না পাও তবে ভেড়ার জাযআহ যবেহ করবে। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে, ভেড়ার জাযআহ কুরবানী করা নিষিদ্ধ এবং কোনো অবস্থায় তা জায়িয হবে না। তাছাড়া সমস্ত বিদ্বান এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত হাদীসটি বাহ্যিক অর্থে নয়। কেননা, অধিকাংশ বিদ্বানের মত হলো– ভেড়ার জাযআহ কুরবানী করা জায়িয চাই অন্য পশু পাক বা না পাক। আর ইবনু 'উমার ও যুহুরী বলেন, সর্বাবস্থায় তা না জায়িয চাই অন্য পশু থাকুক আর না থাকুক। তাহলে নিশ্চিতভাবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসটিতে মুসিন্না না পাওয়া গেলে ভেড়ার জাযআ দ্বারা কুরবানী করা মুস্তাহাব অর্থে ধর্তব্য হবে যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।"[৩৬]

মুসিন্না পশু থাকতেও ভেড়ার জাযআহ্ দ্বারা কুরবানী করা বৈধ হওয়ার কতিপয় দলিল :

১ নং হাদীস :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْنَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِيْ جَذَعٌ، فَقُلْتُ : «ضَحِّ بِهِ».

"উক্ববাহ্ ইবনু 'আমের জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন। আমার ভাগে জাযআ পড়লে তিনি বললেন : "ওটা দিয়েই তুমি কুরবানী করো।"[৩৭]

অন্য বর্ণনায় 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমের বলেন :

«ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ».

"আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ভেড়ার জাযআ দ্বারা কুরবানী করেছি।"[৩৮]

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : «إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّيْ مِمَّا يُوَفِّيْ مِنْهُ الثَّنِيُّ».

'আসিম ইবনু কুলাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা নবী (ﷺ)-এর এক সাহাবীর সাথে ছিলাম, তাঁর নাম হলো মুজাশি'। তিনি সুলাইম গোত্রের ছিলেন। ছাগল সংকট দেখা দিলো। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে এ মর্মে ঘোষণা দিলো যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন : "নিশ্চয় ভেড়ার জাযআহ সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট যে ক্ষেত্রে দাঁতওয়ালা পশু যথেষ্ট।"[৩৯]

---

[৩৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬৩।*

[৩৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩/১৯৬৩; সুনান আন্ নাসায়ী প্রভৃতি।*

[৩৬] *শরহ মুসলিম- ১৩/১১৭।*

[৩৭] *সহীহ মুসলিম; মুখতাসার সহীহ মুসলিম- আলবানীর তাহ্ক্বীক্বকৃত, হা. ১২৫৫, মা. শা., হা. ১৬/১৯৬৫।*

[৩৮] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৩৮২, সনদ ভালো।*

[৩৯] *সুনান আবূ দাউদ- অধ্যায় : কুরবানী, অনুচ্ছেদ : যে পশু দ্বারা কুরবানী করা মুস্তাহাব, হা. ২৭৯৯।*

ভেড়ার জাযআহ (ছয় মাসের বাচ্চা) দ্বারা কুরবানী করা বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনগণের বাণী ও 'আমল :

عن أم سلمة زوج النبي قالت : لأن أضحى بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز.

উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার নিকট ছাগলের মুসিন্না দ্বারা কুরবানী করার চেয়ে ভেড়ার জাযআহ্ দ্বারা কুরবানী করাই বেশি প্রিয়।"[৪০]

عن هشيم قال : أخبرنا حصين هو ابن عبد الرحمن. قال رأيت هلال ابن يساف يضح بجذع من الضأن فقلتُ : أتفعل هذا؟ فقال : رأيت أباهريرة يضح بجذع من الضأن.

(رواه سعيد بن منصور في سننه وإسناده صحيح : انظر فقه الأضحية : ٣٣)

হুশাইম বলেন, আমাকে হুসাইন ইবনু 'আব্দুর রহমান সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন : আমি হেলাল ইবনু ইয়াসাফাকে ভেড়ার জাযআহ দ্বারা কুরবানী করতে দেখে বললাম, আপনি এটা করছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন : "আমি আবূ হুরাইরাহ্কে ভেড়ার জাযআহ দ্বারা কুরবানী করতে দেখেছি।"[৪১] তবে ছাগল প্রভৃতির জাযআ (ছয় মাসের বাচ্চা) দ্বারা কুরবানী দেয়া যাবে না বা বৈধ হবে না।

দলিল : পূর্বে বর্ণিত এ হাদীসটি–

«لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

"তোমরা মুসিন্না অর্থাৎ- যে পশুর নতুন দাঁত গজিয়েছে এ রকম পশু ছাড়া অন্য কোনো পশু কুরবানীতে যবেহ করো না। তবে এ রকম পশু সংগ্রহ করা কষ্টকর হলে ভেড়ার জাযআ তথা ভেড়ার এমন বাচ্চা যবেহ করতে পার যার বয়স ছয়মাস পূর্ণ হয়েছে।"[৪২]

২ নং হাদীস : বারা ইবনু 'আযিবের হাদীস, তিনি বলেন, আমার মামা আবূ বুরদাহ্ ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেন। নবী (ﷺ) এ খবর শুনে বললেন, "এটাতো গোশ্তের ছাগল।" (অর্থাৎ- নিছক গোশ্ত খাওয়ার ছাগল, কুরবানী নয়)। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট ছাগলের জাযআহ রয়েছে। তিনি (ﷺ) বললেন :

ضح بها أنت ولاتصلح لغير.

"ওটাই কুরবানী করো। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্য তা চলবে না।" অপর বর্ণনায়–

«اَذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

"ওটাকেই তুমি কুরবানী করে দাও তবে তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে ঐ রকম পশু কুরবানী জায়িয হবে না বা চলবে না।"[৪৩] ইমাম বুখারীও প্রায় অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

لاتصحا لأضحية إلا بالأ زواجا لثما نية.

কয় শ্রেণীর পশু কুরবানী করা যায় : 'আনআম' শ্রেণীর চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। আনআম হচ্ছে– উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ﴾

"আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 'মানসাক'-এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ 'আনআম' শ্রেণীর যে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সে সবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।"[৪৪]

আয়াতে بهيمة الأنعام (বাহিমাতুল আন'আম) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। আরবদের কাছে بهيمة الأنعام-এর এ অর্থই পরিচিত। এটি হাসান, ক্বাতাদাহ্ ও আরও অনেকের অভিমত।

আট প্রকার পশু দ্বারা কুরবানী সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। তা হলো– (১) ভেড়া বা দুম্বা, (২) ছাগল, (৩) গরু, (৪) উট, এগুলোর প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[৪৫] ইবনু 'আব্দুল বার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

وَالَّذِيْ يُضَحَّى بِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ الْأَزْوَاجُ الثَّمَانِيَةُ : وَهِيَ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ... (انظر تفسير القرطبي عند تفسيره للآية : وفديناه بذبح عظيم)

মুসলিমদের ঐকমত্যে আট প্রকার পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে। তা হলো– ভেড়া বা দুম্বা, ছাগল, উট এবং গরু (এগুলো নর ও মাদি)। তবে ইবনুল মুনযির বলেন, হাসান ইবনু সালেহ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : "গাভী দ্বারা সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে।"[৪৬]

---

[৪০] *বায়হাক্বী, সনদ হাসান; দ্র. ফিকহুল উহিয়্যাহ- ৩৩।*
[৪১] *সা'ঈদ ইবনু মানসূর- সনদ সহীহ; দ্র. ফিকহুল উযহিয়্যাহ- ৩৩।*
[৪২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩/১৯৬৩; সুনান আন্ নাসায়ী প্রমুখ।*
[৪৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭/১৯৬১।*
[৪৪] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৪।*
[৪৫] *সূরা আল আন'আম : ১৪৪ ও ১৪৫।*
[৪৬] *তাফসীর কুরতুবী- সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত-এর ১০৭ নং আয়াতের তাফসীর।*

ইমাম শীরাযী বলেন : চতুষ্পদ জন্তু ছাড়া কুরবানী আদায় হবে না। আর চতুষ্পদ জন্তু হলো– উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

"তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ঐ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়) যা আল্লাহ তাদেরকে রিয্ক হিসাবে প্রদান করেছেন।"[৪৭]

গরুর ন্যায় মহিষের যাকাতের উপর ক্বিয়াস করে অনেকে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়িয বলেছেন।[৪৮] এছাড়া আসমাহ্ থেকে ঘোড়া কুরবানী, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মোরগ কুরবানী, হাসান ইবনু সালেহ থেকে জংলি গাভী ও হরিণ কুরবানী ইত্যাদির কথাও বর্ণিত হয়েছে।[৪৯]

যদিও সহীহুল বুখারী- মীরাট : ১৩২৮ হি., ৮২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আসমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্যগুলোর বর্ণনা সন্দেহ মুক্ত নয়। কিন্তু এ সবের কোনোটিই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত হিসাবে প্রমাণিত নয়।[৫০] বুখারী'র আসমাহ্ বর্ণিত হাদীসে ঘোড়া দ্বারা কুরবানীর কথা আসেনি; বরং সাধারণ যবেহ করার কথা এসেছে। যেমন-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (رضي الله عنها)، قَالَتْ : «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ».

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় একটি ঘোড়া যবেহ করে খেয়েছিলাম।"[৫১]

মোটকথা, আট প্রকার পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ। এতে কোনো মতবিরোধ নেই এবং এগুলো দ্বারা কুরবানী করা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবাদের থেকেও প্রমাণিত। ঐ আট প্রকার পশু হলো– (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, এগুলো নর ও মাদি। অতএব কুরবানী দিতে হলে এগুলো দ্বারাই কুরবানী দেয়া উচিত।

সুস্থ পশু চেনার উপায় : সব থেকে যে বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তাহলো পশুটির সুস্থতা, কেননা অসুস্থ পশু কুরবানীর জন্য বৈধ নয়। এক্ষণে আমরা সুস্থ পশু কিভাবে চিনবো। সুস্থ পশু চেনার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয় :

❖ পশু নিয়মিত জাবর কাটবে। ❖ স্বাভাবিকভাবে সুস্থ পশুরা মাথা নিচু বা পিঠ কুজো করে রাখে না। ❖ সুস্থ পশু আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকবে। ❖ সুস্থ পশুতে কোনো উদাসীন ভাব থাকবে না। ❖ চোখ দু'টো থাকবে উজ্জ্বল ও চঞ্চল। ❖ মাজেল (ঠোঁট) দু'টো হবে একটু ঠাণ্ডা ও ভেজা (ঘামের ফোটায়); উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত ইউরিয়া খাইয়ে গরু মোটা করলে নাইট্রেট বিষক্রিয়ার কারণে মাজেল শুষ্ক থাকে। ❖ জিহ্বা দিয়ে নাক চাটবে, মুখ দিয়ে কোনো লালা ঝরবে না। ❖ কান ও লেজ প্রয়োজন মত নড়াবে। ❖ দেহের লোম হবে মসৃন চকচকে। ❖ শরীরে কোনো পরজীবী (উকুন, আঠালি) থাকবে না। ❖ চামড়ায় কোনো ক্ষত বা রক্তের দাগ অথবা লাঠি দিয়ে পিটানোর দাগ থাকবে না। ❖ শ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে স্বাভাবিক– প্রতি মিনিটে গরু ১০-৩০ বার, ছাগল ২৫-৩৫ বার, মেষ ১০ থেকে ২০ বার হাটালে কোনো রকম খোড়ামি ভাব থাকবে না। ❖ শরীরে কোনো প্রকার ফোলা টিউমারের মত অংশ থাকবে না। তবে জন্মগত কোনো চিহ্ন থাকলে সেগুলোর জন্য কুরবানীর কোনো সমস্যা হবে না। ❖ মুখের সামনে খাবার ধরলে খেতে চাইবে। ❖ পশু কুরবানীর উপযুক্ত বয়স হয়েছে কি না, তা দাঁত দেখে নির্ণয় করতে হবে। এ জন্য পশু কেনার সময় অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিন।

উপসংহার

শরীয়তের পরামর্শ হলো– হৃষ্টপুষ্ট, বেশি গোশ্ত, নিখুঁত এবং দেখতে সুন্দর পশু কুরবানি করা। কুরবানির পশু সব ধরনের দোষত্রুটিমুক্ত হওয়া উত্তম। কোনো খুঁত থাকলে সে পশু কুরবানী করা উচিত নয়। যে পশুতে এমন কোনো খুঁত বা অপূর্ণতা রয়েছে যার কারণে এটির উপযোগিতা কমে যায় ও মূল্য হ্রাস পায়, তেমন পশু কুরবানি করা যাবে না। কুরবানীর পশু কিনতে যে বিষয়গুলো সাধারাণত আমাদের নজর কাড়ে, তা হলো পশুটির গায়ের রং- আমরা সাধারণত লাল, খয়েরি, কালো কিংবা লাল-কালো মিশ্রিত গরু-ছাগল বেশি পছন্দ করি, তাই অন্যান্য রং এর তুলানায় এই রঙের পশুর দাম তুলনামূলক বেশি। অথচ একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সামান্য কিছু টাকার জন্য ফলস্ (কৃত্রিম) রং করে পশু হাটে নিয়ে আসে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা অবশ্যই স্বাস্থ্যবান পশুটি কিনব, কিন্তু অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান পশু থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা মাত্রাতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান পশু মানে ইউরিয়া বা ক্ষতিকর হরমোনাল ঔষধে বেড়ে ওঠা পশু। যা মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ❑

---

[৪৭] *সূরা আল আন'আম : ১৪৪, দ্র. আল মুহাযযা- ৮/৩৯২।*
[৪৮] *মিরআত- ২/৩৫৩-৫৪।*
[৪৯] *মিরআত- ২/৩৫৩-৫৪।*
[৫০] *দ্র. মাসায়েলে কুরবানী- ৫।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫১০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৪২; সুনান আন্ নাসায়ী- ৭/২২৭ প্রভৃতি।*

প্রবন্ধ

যিলহাজ্জ মাস : গুরুত্ব, প্রথম দশকের ফযীলত ও করণীয় ‘আমল

–আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

যিলহাজ্জ মাসের পরিচিতি : হিজরিবর্ষের মাসের সংখ্যা ১২টি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

“আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা হলো বারো। তার মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস।”[৫২] এই ১২ মাসের শেষ মাস যিলহাজ্জ। এমনকি চারটি সম্মানিত মাসের একটি যিলহাজ্জ। যিলহাজ্জ মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাস, যে মাসে হজ্জ ও কুরবানী করা হয়ে থাকে। এ মাসেই মুসলিমদের অন্যতম উৎসব ঈদুল আযহা পালিত হয়।

যিলহাজ্জ মাসের গুরুত্ব : আল্লাহ তা‘আলার নিকট গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যিলহাজ্জ। অল্প সময়ে অধিক নেকী উপার্জনের জন্য আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন মাস ও দিবসকে গুরুত্বারোপ করেছেন। অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে যিলহাজ্জ মাস।

১. যিলহাজ্জ হারাম তথা সম্মানিত মাস : আল কুরআনে বর্ণিত أَشْهُرُ الْحُرُمُ বা সম্মানিত চারটি মাসের একটি যিলহাজ্জ মাস। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিদ্রোহ বা সংঘাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ﴾

“আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা হলো বারো। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের উপর যুলুম করো না।”[৫৩]

চারটি হারাম মাস : যিলক্বদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম ও রজব।

২. হজ্জের মাস যিলহাজ্জ : ‘উমরার জন্য সারা বছর সুযোগ থাকলেও হজ্জের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মাস রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ﴾

“হজ্জ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে। অতএব এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার সংকল্প করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয় এবং তোমরা যে কোনো সৎ কাজই করো, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় তাক্বওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।”[৫৪]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হজ্জের সুনির্দিষ্ট মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহাজ্জ। আল্লাহ তা‘আলা এ মাসগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর ‘উমরাহ্ সারা বছর আদায় করা যায়। এ মাসগুলো ব্যতীত হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে হজ্জ হবে না।[৫৫]

৩. যিলহাজ্জ কুরবানীর মাস : কুরবানী করা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত। যা আমাদের মধ্যে সামর্থ্যবানদেরকে আদায় করতে হয়। আর কুরবানীর জন্য একমাত্র মাস যিলহাজ্জ। এই মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট চারদিন কুরবানী করার বৈধ সময়। কুরবানী করার সময় শুরু হবে ১০ যিলহাজ্জ ঈদুল আযহার সালাতের পর। ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী মহান আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ.

“যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন তদস্থলে আরেকটি যবহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন মহান আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।”[৫৬]

---

* *‘আক্বীদাহ্ ও দাওয়াহ অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*

[৫২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*

[৫৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*

[৫৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৭।*

[৫৫] *তাফসীরে তাবারী- উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫০০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৪১০।*

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত : মহান আল্লাহর কাছে যিলহাজ্জ মাস পুরোটাই ফযীলতপূর্ণ। তবে প্রথম দশকের বিশেষ কিছু ফযীলত রয়েছে। যেমন-

১. যিলহাজ্জের প্রথম দশক নিয়ে আল্লাহর কসম : আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ের কসম করেছেন। অনুরূপভাবে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের কসম করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالْفَجْرِ ○ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ "কসম ভোরবেলার, কসম দশ রাতের।"[৫৭] ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য যিলহাজ্জ মাসের দশ দিন।

২. যিলহাজ্জের প্রথম দশকের 'আমল মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

"যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমলের চেয়ে অন্য কোনো দিনের 'আমলই উত্তম নয়। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।"[৫৮]

৩. বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক : জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ. "দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো যিলহাজ্জের দশ দিন।"[৫৯]

৪. যিলহাজ্জের প্রথম দশকে সকল মৌলিক 'ইবাদত একত্রিত হয় : এই দশকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রায় সকল 'ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্য কোনো সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন- হজ্জ, কুরবানী, সালাত, সিয়াম, দান-সাদাক্বাহ্সহ সকল 'ইবাদত এই দশ দিন একত্রিত করা যায়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.

"এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো, যেহেতু ঐ দিনগুলোতে মৌলিক 'ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে। যেমন- সালাত, সিয়াম, সাদাক্বাহ্ এবং হজ্জ; যা অন্য দিনগুলোতে এভাবে একত্রিত হয় না।"[৬০]

৫. যিলহাজ্জের প্রথম দশকে দ্বীনের নিদর্শনসমূহের সম্মানের সময় : এই দশ দিনে যেহেতু ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত একত্রিত হয়, সেহেতু আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শনসমূহও সম্মান করা সহজ হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ﴾

"এটাই হলো আল্লাহর বিধান, যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাক্বওয়া থেকেই।"[৬১]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন সর্বোত্তম দিন, আর রমাযান মাসের শেষ দশ রাত, সর্বোত্তম রাত।

যিলহাজ্জের প্রথম দশকে করণীয় 'আমল : যিলহাজ্জের প্রথম দশক দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনগুলো আল্লাহ পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বিশাল নিয়ামত। এই দিনগুলো 'ইবাদতের একটা মৌসুম, যা বছরে মাত্র একবার আসে। তাই এই মৌসুমে বেশি বেশি 'ইবাদত-বন্দেগী করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের 'আমলগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- **(ক)** আম বা সাধারণ 'ইবাদত। অর্থাৎ- যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় সকল নেক 'আমল করা। **(খ)** খাস বা বিশেষ 'ইবাদত। অর্থাৎ- যে সকল নেক 'আমল যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের সাথে সম্পৃক্ত; যা বছরের অন্যান্য দিনে করা যায় না।

(ক) আম বা সাধারণ 'আমল; যেগুলো যিলহাজ্জ মাস ছাড়াও সারা বছর করা যায় :

১. তাওবাহ্-ইস্তেগফার করা : তাওবাহ্ অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। নিজের কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সারাজীবনের জন্য খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসার দৃঢ় সংকল্প করা। যিলহাজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলোতে তাওবাহ্ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো, বিশুদ্ধ তাওবাহ্।"[৬২]

---

[৫৭] *সূরা আল ফাজর : ১, ২।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৬৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৭।*
[৫৯] *সহীহুল জামে'- ১১৩৩; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১৫০।*
[৬০] *ফাতহুল বারী- ২/৪৬০।*
[৬১] *সূরা আল হাজ্জ : ৩২।*
[৬২] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ৮।*

২. ফর্‌য ও নফল সালাতগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা : এই ফযীলতপূর্ণ দিনগুলোতে ফর্‌য ও নফল সালাতের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হতে হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফর্‌য 'ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো 'ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল 'ইবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিই। (অবস্থা এমন যে,) আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোনো কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিই। আমি যে কোনো কাজ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে অথচ আমি তার প্রতি কষ্টদায়ক বস্তু দিতে অপছন্দ করি।"[৬৩]

৩. সিয়াম পালন করা : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে সিয়াম পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'আমল। বান্দার পাপরাশি ক্ষমাকরণে সিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে প্রতিদান দেন। তাই এ দিনগুলোতে খুব যত্নসহকারে সিয়াম পালন করা উচিত। হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ (ﷺ) صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো চারটি 'আমল পরিত্যাগ করেননি। সেগুলো যথাক্রমে- আশুরার সাওম, যিলহাজ্জের দশ দিনের সিয়াম, প্রত্যেক মাসে তিন দিনের সিয়াম ও ফযরের পূর্বের দুই রাকআত সালাত।"[৬৪] আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ، بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا».

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।"[৬৫]

৪. বেশি বেশি যিকর-আযকার করা : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যিলহাজ্জের প্রথম দশক। তাই এই দিনগুলোতে অন্যান্য 'ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি বেশি বেশি যিকর-আযকার করা উচিত। যিকর-আযকার বলতে অধিক পরিমাণে তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করা। আল্লাহ বলেন–

﴿لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

"যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিয্‌ক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।"[৬৬] রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ.

"এই দিনসমূহ মহান আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং এই দশ দিনের মধ্যে সম্পাদিত 'আমল মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। সুতরাং এই দিনগুলোতে তোমরা বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করো।"[৬৭]

চারটি যিক্‌র বেশি বেশি পাঠ করার চেষ্টা করতে হবে। সেগুলো হলো– তাসবীহ سُبْحَانَ اللهِ, তাহমীদ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, তাহলীল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ, তাকবীর اَللهُ أَكْبَر।[৬৮]

৫. দান-সাদাক্বাহ্ করা : দান-সাদাক্বাহ্ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। আর এই 'আমলটি করার সুবর্ণ সময় হলো যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক। দান-সাদাক্বার মাধ্যমে

---

[৬৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২।*

[৬৪] *মুসনাদ আহমাদ- ৬/২৮৭, হা. ২৬৪৫৯; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২১০৬; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২২৩৬।*

[৬৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৪০; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৩।*

[৬৬] *সূরা আল হাজ্জ : ২৮।*

[৬৭] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৫৪৪৬; সহীহুত্ তারগীব- হা. ১২৪৮।*

[৬৮] *মুসনাদ আহমাদ- আল-মুসনাদ, হা. ৫৪৪৬।*

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, অভাবগ্রস্তকে উপকার করা যায় আর নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করা যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾

“তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করো এবং তোমরা কোনো উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না।”[৬৯]

দান-সাদাক্বাহ্ করার নির্দেশ : রাসূল (ﷺ) দান-সাদাক্বাহ্ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

“তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা করো এক টুকরা খেজুর সাদাক্বাহ্ করে হলেও।”[৭০] এছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত, রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ, অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থেকে বেশি বেশি নেক ‘আমলে রত থাকা আর সকল ধরনের পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

(খ) খাস বা বিশেষ ‘আমল; যেগুলো শুধু যিলহাজ্জের প্রথম দশকের সাথে সম্পৃক্ত :

১. হজ্জ পালন করা : হজ্জ পালনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কয়েকটি মাস থাকলেও একমাত্র হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় যিলহাজ্জ মাসে। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের উপর হজ্জ পালন করা ফরয।[৭১] রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

“যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল আচরণ করেনি, কোনো পাপে লিপ্ত হয়নি, তাহলে সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে গেল, যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল।”[৭২] অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«اَلْعُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

“এক ‘উমরাহ্ থেকে অন্য ‘উমরাহ্কে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কবুল হজ্জের পুরস্কার হলো জান্নাত।”[৭৩]

২. ঈদুল আযহার সালাত আদায় করা : প্রথম দশকের অন্যতম ‘আমল ঈদুল আযহার সালাত আদায় করা। আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

“রাসূল (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ করতেন তা হলো সালাত আদায়। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোনো সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোনো বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন।”[৭৪] উল্লেখ্য, মহিলারাও ঈদের সালাতে পুরুষদের সাথে পর্দা সহকারে গমন করে সালাত আদায় করতে পারবে।

৩. কুরবানী করা : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের বিশেষ আরেকটি ‘আমল হলো কুরবানী করা। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান সে হজ্জ পালনকারী হোন বা হজ্জের বাইরে থাকুন সকলেই এই দিনে কুরবানী করে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। হজ্জে তামাত্তু‘ ও হজ্জে ক্বিরানকারীগণ মিনা ও তার আশপাশ হারাম এলাকায় আর হজ্জের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা তাদের স্ব স্ব অবস্থানস্থলে কুরবানী করেন। কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ “তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো।”[৭৫] রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

“যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।”[৭৬] তবে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আবূ বক্‌র, ‘উমার ফারূক, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস, বিলাল, আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ

---

[৬৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭২।*
[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১৭।*
[৭১] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৯৭।*
[৭২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৪৯, মাকতাবাতুশ্ শামেলাহ্, হা. ১৫২১; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫০।*
[৭৩] *বুখারী- ১৬৮৩, মা. শা., হা. ১৭৭৩; মুসলিম- হা. ১৩৪৯।*
[৭৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫৬।*
[৭৫] *সূরা আল কাওসার : ২।*
[৭৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১২৩; সহীহুল জামে‘- হা. ৬৪৯০।*

সাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[৭৭] প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর একটি পশু দ্বারা কুরবানী করাই যথেষ্ট।[৭৮] তবে কুরবানীর সওয়াব বিবেচিত হবে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। কুরবানী শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে রাজি-খুশি ও তার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।”[৭৯]

৪. আরাফার সাওম পালন করা : সর্বশ্রেষ্ঠ নফল সিয়াম হলো আরাফার দিনের সিয়াম। আর এই আরাফার দিন শুধু যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে। হজ্জ পালনকারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমগণ এ দিনে সওম পালন করবে। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরাফার দিনের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

“আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী, এটা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহর কাফ্ফারা হবে।”[৮০]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبَ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ.

“যে ব্যক্তি আরাফার দিন সাওম রাখে তার পরপর দুই বছরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।”[৮১]

৫. চুল ও নখ কর্তন না করা : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের আরেকটি ‘আমল হলো যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ কর্তন না করা। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِيْ الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

“যে যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখল এবং কুরবানী করার ইচ্ছা করল, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।”[৮২]

কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে এ ‘আমল করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি কুরবানীর পূর্ণ সওয়াব পাবে।[৮৩]

৭. তাকবীর পাঠ করা : সাধারণত যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করতে হবে। বিশেষ করে ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফর্য সালাত শেষে তাকবীর পাঠ করা।[৮৪] ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরাফার দিন ফজর থেকে কুরবানীর দিন আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।[৮৫] বিশুদ্ধ তাকবীর হলো–

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা’বূদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আর সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।”[৮৬] হাজীগণ ইহরাম বাধার পর তাকবীর দিবেন। তবে হজ্জের দিনগুলো তথা ৮-১২ যিলহাজ্জ বেশি বেশি নিচের তালবিয়া পাঠ করবেন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

“আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই আপনারই; আপনার কোনো শরীক নেই।”[৮৭] এই দিনগুলোতে তাকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।[৮৮]

উল্লেখিত ‘আমলগুলো পালনের মাধ্যমে যিলহাজ্জ মাসের যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়, ফযীলত লাভ করা যায় এবং নিজেদেরকে পাপমুক্ত করা যায়। আর অশেষ সওয়াব হাসিলের মাধ্যমে জান্নাতের পথকে সহজ করা যায়। তাই আমাদের উচিত, যিলহাজ্জ মাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘ইবাদত-বন্দেগী, নেক ‘আমল ও যিক্র-আযকারের মাধ্যমে ফযীলতপূর্ণ উক্ত মাসকে অতিবাহিত করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৭৭] *বায়হাক্বী- ৯/২৬৪ পৃ., ১৯৫০৬; ইরওয়া- ১১৩৯, ৪/৩৫৪; মিরআত- ৫/৭২-৭৩; উসাইমীন, মাজমূ‘ ফাতওয়া- ২৫/১০।*

[৭৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৭৮৮; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫১৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪৭৮।*

[৭৯] *সূরা আন‘আম : ১৬২।*

[৮০] *মুসলিম- হা. ১১৬৩, ২৮০৩; আবূ দাউদ- ২৪২৫, সহীহ।*

[৮১] *ত্বাবারানী- হা. ৫৭৯০; সহীহুত তারগীব- হা. ১০১২।*

[৮২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭৭; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৭৯১; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২৩।*

[৮৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৭৮৯।*

[৮৪] *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২৪/২২০।*

[৮৫] *যাদুল মা‘আদ- ২/৩৬০।*

[৮৬] *দারাকুতনী- হা. ১৭৫৬; ইরওয়াউল গালীল- ৩/১২৫, ৬৫৪।*

[৮৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮৪; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮১২।*

[৮৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*

শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★
প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক★

[দ্বিতীয় পর্ব]

১৯১১ সাল। তুখোড় সমবায় কর্মকর্তা ফজলুল হকের পদোন্নতি হবে। তিনি রেজিস্ট্রার হয়ে আরও নিবিড়ভাবে বিপর্যস্ত কৃষককূল নিয়ে কাজ করবে। কিন্তু তা হলো না। সরকার অবিচার করলেন। পদোন্নতি পেলেন অন্যজন'। ক্ষোভ ও অভিমানে ফজলুল হক সিদ্ধান্ত নিলেন, ইংরেজদের গোলামী করবেন না; ডায়মন্ড হারবারের এসডিও'র পদায়ন অগ্রাহ্য করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা ও রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯১১ সালে তার কলকাতা আগমন উপলক্ষে উৎসব মুখর পরিবেশ রচিত হয়। গোলামির জিঞ্জির, দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ফজলুল হক কলকাতায় আসছেন জেনে মুক্তিকামী মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ে। দূরদর্শী নেতা স্যার সলিমুল্লাহর নির্দেশে নবাব আব্দুল লতিফ, নবাব সিরাজুল ইসলাম, আবুল কাশেম, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, মাওলানা বেলায়েত হোসেন প্রমুখ মুসলিম প্রধানের উদ্যোগে ফজলুল হকের আগমন উপলক্ষে শিয়ালদহ স্টেশন লোকের উপচেপড়া ভিড়ে এক বর্ণিল অধ্যায় রচিত হয়। মুসলিম বাংলার ভাগ্যাকাশে যেন উদিত হলো নবান্নের অরুণোদয়।

ফজলুল হকের চাকুরি ত্যাগ, কলকাতা আগমন, হাইকোর্টে যোগদান সেদিনকার একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। তাঁর ওজস্বিনী বাগ্মীতায় সাহস ও বীরত্বে শুধু স্যার সলিমুল্লাহই আশ্বস্ত হননি; মুসলমান সমাজে দেখা দেয় এক নবজাগরণ। নবচেতনা, নবপ্রাণচাঞ্চল্য, নবআশা, নব আকাঙ্ক্ষা যেন প্রাণ ফিরে পেল অসহায় মানুষ-মানবতা। বলা বাহুল্য, স্যার সলিমুল্লাহর ইঙ্গিতেই স্যার হাসান ইমাম, মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ ও কলকাতার মুসলিম প্রধানগণ ফজলুল হকের নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং নেতৃত্ব বরণের জন্য ৫/৬ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে বিরাট আয়োজন করেন।

রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে ফজলুল হককে এসিড টেস্টের মুখোমুখি হতে হয়। ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রের শূন্য পদে সদস্য নির্বাচন। তখনকার দিনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ছিল না। খাজনা ও সেসের ভিত্তিতেই ছিল ভোটাধিকার। ভোটারদের শতকরা ৯৫ জনই হিন্দু। অধিকন্তু বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। সৃষ্ট এ তিক্ততার মাঝে কোনো মুসলমানই এ নির্বাচনে প্রার্থী হতে সাহসী হননি। কিন্তু দুঃসাহসী ফজলুল হক স্যার সলিমুল্লাহর ইঙ্গিতেই তাঁরই মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রায় বাহাদুর কুমার মহেন্দ্র মিত্রের পরাজয় ঘটে। শুরু হয় ফজলুল হকের অপরাজেয় রাজনৈতিক জীবন। মুসলমান হয়েও বর্ণ হিন্দুর ভোটে বর্ণহিন্দুকে পরাজিত করে নির্বাচনে বিজয় অর্জন তাঁর অসাধারণ ক্যারিশমা! এটি যেন ফজলুল হকের প্রাপ্য এবং তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

নির্বাচনে বিজয়ী ফজলুল হক হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয় নেতারূপে চিহ্নিত হন। আর এভাবে একজন বাঙালি ফজলুল হকের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিভাগ[৮৯] থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। একজন সফল ও তার্কিক আইন প্রণেতা হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও অপরিহার্যতার ব্যারোমিটার তুঙ্গে উঠে। তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্তই প্রাদেশিক আইন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৫-৩৭ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর তুখোড় সদস্য ছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাংলার জনগণের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ ছিল। এর ফলে বাংলার সামাজিক

★ **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
★ **প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৮৯] বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। মুসলমানদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এ ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে ফজলুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গভঙ্গের সুফল গ্রামবাংলার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ফজলুল হকের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মাত্র ছয় বছর পর এটি রদ হলে দেশপ্রেমিক ফজলুল হক দারুণভাবে ব্যথিত হন। তিনি এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেন। মুসলমানদের প্রতি অবিচার ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তিনি শুধু প্রতিবাদই করেননি তিনি অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তিনি সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, 'প্রয়োজনবোধে মুসলমানরা আন্দোলনকে ভবিষ্যতে তাদের অধিকার ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হবে না'। বাঙালি জাতির স্বার্থে তার এ ধরনের অভিব্যক্তি ছিল অপূর্ব ও অভিনব।

রাজনীতির ময়দানে ফজলুল হকের সফলতা অর্জনের কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি অনুধাবন করেছিলেন কৃষক প্রজার দুর্দশা ও শিক্ষা অধোগতির করুণ দশা। ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা ক্ষেত্রে অবাধ লুণ্ঠন এবং রাজস্ব বিভাগের[৯০] প্রকাশ্য দস্যুতার ফলে সুজলা-সুফলা বাংলার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। মন্বন্তরে[৯১] আক্রান্ত হয়ে এক কোটি লোক প্রাণ হারায়। আবার ১৭৭৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ায় ইংরেজ অনুগত জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। ঘনঘন খাজনা বৃদ্ধি, নির্মম উপায়ে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা কৃষকদের নাজেহাল করে তোলে। কৃষক সমাজ ভূমির উপর অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং ভূমিদাসে পরিণত হয়। যুগপৎভাবে ইংরেজ কোম্পানী ও জমিদারদের শোষণ নিপীড়নে কৃষকদের ভূমি থেকে উৎখাত করা হতো। তারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে কোনো রকমে টিকে থাকতে চেষ্টা করতো।

[৯০] ১৭১৫ সালে ইংরেজ গভর্ণর লর্ড ক্লাইভ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী বা খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। খাজনা আদায়ের নামে কৃষককূলকে সর্বশ্যান্ত করবার সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

[৯১] ১৭৭০ বাংলা ১৭৭৬ সালে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ১ কোটি লোক প্রাণ হারায়। ইতিহাসে ইহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ফজলুল হক আরও অনুধাবন করেন যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়, ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যকার বাংলার জন মানসকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ১৮২০-৬০ সালের ফরায়েজী আন্দোলন উত্তরবঙ্গের ফকির বিদ্রোহ ও শেরপুরের পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ টিকে থাকার প্রশ্নে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিরোধ বলা যায়। এমনি ঘটনা প্রবাহে পথ পরিক্রমায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবসান হয় এবং ভারত ইংল্যান্ডের রানীর শাসনাধীনে চলে যায়।

বাঙালীদের কব্জীভূত করবার আইনী কৌশল আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯০ সালে সৃষ্টি হয় পুলিশী শাসন। ইতোমধ্যে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তিত হয়। একই বছরে ভাষাগত কারণে বিপুল সংখ্যক ফার্সিভাষী অবাঙালি চাকুরীচ্যুত হয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়ে। নানা বাস্তবমুখী কারণে ইংরেজদের সাথে বাঙালিদের দূরত্ব বাড়ে। উপরন্তু তদানীন্তন মুসলমান ধর্মীয় নেতারা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা শুরু করে। অপরদিকে হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে ইংরেজদের আনুগত্য লাভে সক্ষম হয়। নৈকট্য অর্জনের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে হিন্দুরা জায়গা করে নেয়। সৃষ্ট জমিদারী অনুগ্রহভাজন হিন্দুরা অর্জন করে। ভারসাম্যহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় অবিভক্ত বাংলা।

ফজলুল হক এমনি বিরূপ পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে প্রবেশ করেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কৃষকদের গ্রাম্য অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন। প্রজাসাধারণের আর কতিপয় সমস্যার মধ্যে ঋণ সমস্যা ছিল অন্যতম। বাংলার কৃষক প্রজার ঋণের পরিমাণ পর্বতসম; প্রায় একশত কোটি টাকা। শতকরা ৯৫ জনই ঋণগ্রস্ত। লোন এক মারাত্মক অর্থসংকটে নিপতিত কৃষক সমাজ আকুল ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিদ্যমান আইন ব্যবস্থায় ঋণমুক্তির গত্যন্তর ছিল না। শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক প্রজা আইন করে খাজনা বৃদ্ধিও আবোয়াব[৯২]। আদায় চিরতরে বন্ধ করে দেন।

[৯২] শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক কর্তৃক পরিচালিত এক জরীপে জানা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী জমিদার বা বার্ষিক ৫ কোটি টাকা সরকারকে রাজস্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু

ফজলুল হক বাংলার কৃষক-প্রজাদের দুর্দশা মোচনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে জোর প্রচেষ্টা চালান। এই আইন সংশোধিত হলে কৃষকগণ কিছু কিছু অধিকার লাভ করেন। ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য কতকগুলো আইনগত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হন। হক সাহেব ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিয়ে নিতে সমর্থ হন এবং এতে তিনি 'বাংলার দরিদ্র কৃষকদের এক মহান রক্ষাকর্তা' হিসাবে আবির্ভূত হন। এই আইন সংশোধনের ফলে জমির খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে জমিদারদের ক্ষমতার উপর বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়; জমিদাররা ১০ বৎসরের মধ্যে প্রজাদের পক্ষ হতে দেয় খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবেন না বলে বিধান করা হয়; কৃষকদের নিকট হতে জমিদারদের সেলামী (বা ভূমি হস্তান্তর ফি) আদায়ের অধিকার, জমি পূনর্দখলের অধিকার এবং সার্টিফিকেট প্রক্রিয়ায় খাজনা আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত করা হয়।[৯৩] কৃষকরা মাত্র চার বৎসরের খাজনা পরিশোধ করার মাধ্যমে ২০ বৎসরের মধ্যে তাদের নদীসিকস্তি জমি পুনরুদ্ধার করার অধিকার লাভ করেন। প্রজাদের দেয় বকেয়া খাজনার সুদের হার অর্ধেক হ্রাস করে শতকরা ১২$^{১}/_{২}$ ভাগ হতে ৬$^{১}/_{৪}$ ভাগ করা হয়। ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন নিঃসন্দেহে বাংলায় প্রগতিশীল আইনের বিকাশধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ই ছিল এবং প্রজাদেরকে অনেক সুবিধা প্রদান করেছিল।[৯৪] ফজলুল হক কৃষকদের ঋণের দুর্বহ বোঝা লাঘবের জন্য বঙ্গীয় কৃষি ঋণ গ্রহীতা আইনের (Bengal Agricultural Debtors Act) আওতায় ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে সহজ কিস্তিতে কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। প্রদেশে এ উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করা হয়।

ফজলুল হক গ্রাম বাংলার মানুষকে মহাজনদের শোষণের হাত হতে বাঁচানোর জন্য ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় মহাজন আইন (Bengal Money-lenders Act) বিধিবদ্ধ করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ আইনবলে অর্থ ঋণদানের কারবারে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির (মহাজন) জন্য সরকারের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইনে ঋণের সুদের হারও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়; নিশ্চিতকৃত ঋণের সর্বোচ্চ হার শতকরা ৬ ভাগ এবং অনিশ্চিতকৃত ঋণের সর্বোচ্চ হার শতকরা ৮ ভাগ হবে বলে নির্ধারণ করা হয়।[৯৫]

ফজলুল হক জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করতে না পারলেও, তিনি এ প্রথা বিলোপের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[৯৬] তিনি বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করার জন্য ফ্লান্সিস ফ্লাউডকে (Franchis Floud) চেয়ারম্যান নিয়োগ করে একটি কমিশন গঠন করেন। 'ফ্লাউড কমিশন' নামে পরিচিত এ কমিশনে জমিদার ও প্রজাদের প্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কমিশন জমিদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ভিত্তিতে জমিদারি প্রথা বিলোপের সুপারিশ করেছিল। তদনুযায়ী পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। সুতরাং জমিদারী প্রথা বিলোপ করে ভূমিতে প্রজাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠায় ফজলুল হক অবশ্যই প্রশংসনীয় ভূমিকাই পালন করেছিলেন। জনসাধারণের নিকট আস্থাভাজন রাজনীতিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। ❑

জমিদারদের তৌজি, খাজনার তফসিল ও খতিয়ান অনুসারে দেখা যায় যে, তারা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে প্রায় ১৮ কোটি টাকা; অর্থাৎ- সরকারকে প্রদেয় রাজস্বের প্রায় তিনগুণ আদায় করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রজারা জমিদারদের খাজনা দেন বার্ষিক ৬৩ কোটি টাকা! ৫৭ কোটি টাকা বেআইনী খাজনা আবোয়াব ও বিবিধ করের মাধ্যমে আদায় করা হতো। মধ্য স্বত্বভোগী, তালুকদার, নিম তালুকদার, পত্তনীদার, হাওলাদার প্রভৃতি স্বত্বাধিকারীরাও এই টাকার অংশ পেতেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের কাছ থেকে যে সকল আবোয়াব বা বেআইনী কর আদায় করতো তার মধ্যে ছিল– তহরী, সেস, নজর, পেয়াদাগাণ, রোশন, খোদনগর, নায়েব, মুহুরী, হালদারী, দলিল খরচ, ভান্ডারী, ডাক খরচ, পার্বনী, খারিজ বিবাহ কর, পুলিশ খরচ, রথ খরচ, বরদারী, ভেট, সেলামী, জরিমানা ও স্কুল খরচ প্রভৃতি। জমিদার ও তাদের অধঃস্তন মধ্যস্বত্ব ভোগীরা। প্রজাদের কাছ থেকে মূল খাজনার তুলনায় কমপক্ষে বিশ গুণ অর্থ আদায় করতো।

[৯৩] Shila Sen, Muslim Politisin Bengal, p. 104।

[৯৪] Ibid, p. 102।

[৯৫] Ibid, p. 103।

[৯৬] M A. Rahim, op. cit., p. 254।

ক্বাসাসুল কুরআন

হাবীল কাবীলের কুরবানী

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

আরবি ‘কুরবান’ (قربان) শব্দটি ফারসী বা উর্দুতে ‘কুরবান’ রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ ‘নৈকট্য’। পারিভাষিক অর্থে ‘কুরবানী’ ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়।[৯৭] প্রচলিত অর্থে, ঈদুল আযহার দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবেহ করা হয়, তাকে ‘কুরবানী’ বলা হয়। সকালে রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে ‘কুরবানী’ করা হয় বলে এই দিনটিকে ‘ইয়াওমুল আযহা’ বলা হয়ে থাকে।[৯৮]

কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সে আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۭ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۭ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○ لَىِٕنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ○ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۭ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ﴾

“আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। তাদের একজন বলে, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অন্যজন বলে, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না। কেননা আমি তো ভয় করি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে। আমি চাই, তুমি বহন করো আমার ও তোমার গুনাহের বোঝা, তারপর তুমি জাহান্নামবাসীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। এটাই হলো অত্যাচারীদের শাস্তি। তারপর তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করার উস্কানি দিলো এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে। সে বলল– হায়! আমি কি হলাম এ কাকের মতও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ লুকাতে পারি? তারপর সে অনুতাপ করতে লাগল!”[৯৯]

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কুরবানী কে, কোথায়, কিভাবে দিয়েছিল এ ব্যাপারে ঘটনাটি নিম্নরূপ :

যখন আদম ও হাওয়া (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাঁদের সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া জোড়া (যমজ) অর্থাৎ- একসাথে একটি পুত্র ও একটি কন্যা –এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেবল শীস (আলাইহিস সালাম) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ভাই-বোন ছাড়া আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা‘আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য সম্পর্ক প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারীনি কন্যা সহোদরা বোন হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। সুতরাং সে সময় আদম (আলাইহিস সালাম) একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে কাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী। তার নাম ছিল ইকলিমা। কিন্তু হাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে ততটা সুন্দরী ছিল না। সে ছিল কুশ্রী ও কদাকার। তার নাম ছিল লিওয়া। বিবাহের সময় হলে শরয়ী‘ নিয়মানুযায়ী হাবীলের সহোদরা কুশ্রী বোন কাবীলের ভাগে পড়ে। ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) যখন লিওয়াকে কাবীলের সাথে বিবাহ দিতে চান, তখন কাবীল তা প্রত্যাখ্যান করে জেদ ধরে বলে, ‘আমার সহজাত বোনকেই আমি বিয়ে করব। কেননা, আমি আমার এ জুড়ি বোনের বেশি হক্বদার।’ কিন্তু আদম (আলাইহিস সালাম) তৎকালীন শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তাঁর নির্দেশ মানতে বলেন।

---

[৯৭] *আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব- মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, পৃ. ১৫৮।*

[৯৮] *নায়লুল আওত্বার- ইমাম শাওকানী, ৬/২২৮ পৃ.।*

[৯৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭-৩১।*

কিন্তু সে মানেনি। এবার তিনি তাকে বকাঝকা করেন। তবুও সে বকাঝকায় কান দেয় না। অবশেষে আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর এ দু'সন্তান হাবীল ও কাবীলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা উভয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করো, যার কুরবানী গৃহীত হবে, তার সাথেই ইকলীমার বিয়ে দেয়া হবে।' সে সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কুরবানীকে পুড়ে ফেলত। আর যার কুরবানী কবুল হতো না তারটা পড়ে থাকত। যাহোক, তাঁদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো– কাবীল ছিল চাষী। তাই সে গমের শীষ থেকে ভালো ভালো মালগুলো বের করে এবং বাজে মালগুলোর একটি আঁটি কুরবানীর জন্য পেশ করে। আর হাবীল ছিল পশুপালনকারী। তাই সে তার জন্তুর মধ্য থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুম্বা কুরবানীর জন্য পেশ করে। এরপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে আগুনের শিখা এসে হাবীলের কুরবানীটি পুড়ে ভস্মিত করে দেয়।

ফতহুল ক্বাদীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাবীলের পেশকৃত দুম্বাটি জান্নাতে ওঠিয়ে নেয়া হয় এবং তা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে। অবশেষে ইসমা'ঈল যাবিহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)-কে সে দুম্বাটি পাঠিয়ে বাঁচিয়ে দেয়া হয়। আর কাবীলের কুরবানী যথাস্থানেই পড়ে থাকে। অর্থাৎ- হাবীলেরটি গৃহীত হলো আর কাবীলেরটি হলো না। কিন্তু কাবীল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে নি। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। সে আত্মসংবরণ করতে না পেড়ে প্রকাশ্যে তার ভাইকে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করে, এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে ওঠেছিল। হাবীল বলেছিল, 'তিনি মুত্তাক্বীর কাজই গ্রহণ করেন। সুতরাং তুমি তাক্বওয়ার কাজই গ্রহণ করো। তুমি তাক্বওয়া অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করোনি, তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কোথায়?... তবুও এক পর্যায়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করে।[১০০]

কুরআনে বর্ণিত হাবীল ও কাবীল কর্তৃক সম্পাদিত কুরবানীর এ ঘটনা থেকেই মূলত কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, কুরবানীদাতা 'হাবীল', যিনি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি সুন্দর দুম্বা কুরবানী হিসেবে পেশ করেন। ফলে তার কুরবানী কবুল হয়। পক্ষান্তরে কাবীল, সে অমনোযোগী অবস্থায় কিছু খাদ্যশস্য কুরবানী হিসেবে পেশ করে। ফলে তার কুরবানী কবুল হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো কুরবানী মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া কবুল হয় না। এরপর থেকে বিগত সকল উম্মতের ওপরে এটা জারি ছিল। আল্লাহ বলেছেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা এ পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ জন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিয্ক নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমাদের প্রভু তো কেবল একজনই তারই জন্য আত্মসমর্পণ করো আর বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও।"[১০১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেছেন, আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন।[১০২]

আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে তাঁরই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ইতিহাস ততটা প্রাচীন যতটা প্রাচীন দ্বীন-ধর্ম অথবা মানবজাতির ইতিহাস। মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যত শরীয়ত নাযিল হয়েছে, প্রত্যেক শরীয়তের মধ্যে কুরবানী করার বিধান চালু ছিল। প্রত্যেক উম্মতের 'ইবাদতের এ ছিল একটা অপরিহার্য অংশ। কিন্তু সেসব কুরবানীর কোনো বর্ণনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মূলত সেসব কুরবানীর নিয়মকানুন আমাদেরকে জানানো হয়নি।

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ। অর্থাৎ- যুলহিজ্জার দশম তারিখে সুনির্দিষ্ট পশুর রক্ত প্রবাহিত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের প্রচেষ্টাস্বরূপ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর আজ যে কুরবানীর বিধান প্রতিষ্ঠিত, তা মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহীম ও তদ্বীয় পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিমাস সালাম)-এর মধ্যকার এক বেদনাময় রোমহর্ষক পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার বিরল দৃষ্টান্তের প্রদর্শনী। কিন্তু সময়ের পালাবদলে আমরা আজ ইব্রাহীমী চেতনা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছি। আজও আমাদের মাঝে কুরবানীর বিধান চালু আছে। তবে এ কুরবানীর সাথে তাক্বওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা যেন বড্ড বেমানান। তাক্বওয়ার পরিবর্তে লৌকিকতা ও প্রদর্শনী আমাদের কুরবানীকে কলুষিত করছে। ❑

[১০০] *তাফসীরে দুররে মনসূর; ফাতহুল বায়ান- ৩/৪৫ ও ফাতহুল ক্বাদীর- ২/২৮-২৯।*

[১০১] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৪।*

[১০২] *তাফসীরে নাসাফী- ৩/৭৯; কাশশাফ- ২/৩৩।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

নিজের নামের সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করা

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : বিবাহিত নারীর সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করা এবং স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়া বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি সংস্কৃতি। মূলত ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাবে এ সংস্কৃতির প্রচলন ঘটেছে। আজ আমরা এ বিষয়ে শরঈ বিধান কী সে সম্বন্ধে আলোকপাত করব।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে মুসলিম নারীদের অনেকেই বিয়ের পরে নিজের নামের সাথে স্বামীর নামকে যুক্ত করে তা নিজের নামের অংশ বানিয়ে ফেলে। এটি একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অনেকে এটাকে স্বামীর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলেও মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি আমাদের সমাজে পশ্চিমা ইহুদি-নাসারাদের কৃষ্টি-কালচারের ব্যাপক প্রচলন এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল।

ইসলামী স্কলারদের মতে, ইসলামে জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে পরিচয় সম্বন্ধ করা নিষিদ্ধ। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম প্রথা।

যদি স্বামীর নামের সাথে স্ত্রীর নাম যুক্ত করা মর্যাদার বিষয় হত তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রিয় নবী (ﷺ)-এর নামের সাথে তাঁর প্রিয় সহধর্মিণীগণ নাম যুক্ত করাকে বিশাল মর্যাদার বিষয় মনে করতেন। কিন্তু তারা তা করেন নি। সাহাবি, তাবেয়ী বা তৎপরবর্তী কোনো কালেই মুসলিমদের মাঝে এমন প্রচলন ছিল না। কিন্তু অধুনা যুগে মুসলিমরা দ্বীনের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে কাফিরদের সাংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে একান্ত তাদের বিষয়গুলোকে নিজেরা গিলতে শুরু করেছে-যা খুবই দুঃখজনক। অথচ ইসলামী শিষ্টাচার হলো, নিজের নামের সাথে নিজের পিতার নাম যুক্ত করা। যেমন- ফাতিমাহ্ বিনতু মুহাম্মদ অথবা ফাতিমাহ্ মুহাম্মদ (বিনতু দেয়া বা না দেয়া উভয়টি সঠিক)।

(এটি পুরুষ-মহিলা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ﴾

“তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।”[১০৩]

এ আয়াতে ইসলামে একমাত্র পিতার সঙ্গেই পরিচয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

যাহোক, যারা এমনটি করেন তাদের সচেতন হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত হাদীসগুলো যথেষ্ট হতে পারে :

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

“যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সঙ্গে বংশ সম্পর্কিত দাবি করল যে বংশের সঙ্গে তার কোনো বংশ সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।”[১০৪]

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

“যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে জন্মসূত্র স্থাপন করে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তাকুল ও সব মানুষের অভিসম্পাত।”[১০৫]

এসব কঠোর হুমকি ঐ সকল ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য যারা নিজের জন্মদাতা পিতার স্থানে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বংশের নাম স্থাপন করে এবং সেই নামেই নিজের পরিচয় দেয়।

এটি কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ : ইসলামে অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ-চাই তা ‘ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক অথবা আচার-আচরণ, পোশাক-

---

[১০৩] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৫।*

[১০৪] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ৬১/মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছেদ : ৬১/৫; সহীহ মুসলিম- ১/২৭।*

[১০৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : ১৪/হদ (দণ্ড); পরিচ্ছেদ : ১৪/৩৬. কোনো ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে এবং নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বলে পরিচয় দিলে।*

পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি বা কৃষ্টি-কালচারের ক্ষেত্রে হোক। কেননা হাদীসে এসেছে–

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।"[১০৬]

এছাড়াও হাদীসে প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের পূর্বে অনেক মুসলিম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন– বর্তমানে যার বাস্তব প্রতিফলন আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সাহাবী আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حذو القذة بالقذة حَتَّى لَوْ دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدخلتتُمُوهُ قالوا : يَا رسول الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. قَالَ : فَمَنْ؟

"তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী উম্মতদের অভ্যাস ও রীতি-নীতির ঠিক ঐ রকম অনুসরণ করবে, যেমন এক তীরের ফলা অন্য এক তীরের ফলার সমান হয়। অর্থাৎ- তোমরা পদে পদে তাদের অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি শাণ্ডা (মরুভূমিতে বসবাসকারী গুই সাপের ন্যায় এক ধরনের জন্তু বিশেষ)-এর গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে।"

সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী উম্মত দ্বারা আপনি কি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বুঝাচ্ছেন?

তিনি বললেন : তবে আর কারা?

[সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী– "তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।" তবে বুখারী'র বর্ণনায় حذو القذة بالقذة-এই শব্দসমূহ নেই। তার স্থলে شبرا بشبر وذراعا بذراع শব্দগুলো রয়েছে। অর্থাৎ- এক হাতের বিঘত যেমন অন্য হাতের বিঘতের সমান হয় এবং এক হাতের বাহু অন্য হাতের বাহুর সমান হয়।]

[১০৬] *সুনান আবূ দাউদ- অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ, হা. ৪০৩১, হাসান সহীহ।*

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال... ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك.

"মুসলিমদের জন্য কাফিরদের উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য, পোশাক, গোসল ইত্যাদি কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তাদের উৎসবের কাজে লাগানো হয় এমন জিনিসও এ উদ্দেশ্যে বিক্রয় করাও বৈধ নয়।"

আমাদের অজানা নয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে বা অন্য কোনো কারণে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতে পারে, তারপর অন্যত্র বিয়ের মাধ্যমে স্বামী পরিবর্তন হতে পারে। তখন আগের স্বামীর এ নামের কোনো মূল্য থাকবে না। কিন্তু বাবা-মেয়ের রক্ত সম্পর্ক চিরকালীন। এটা কোনো অবস্থায় পরিবর্তন হবে না। তাছাড়া এটি নিজের পিতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা, অসদাচরণ ও সম্মানহানিও বটে। অথচ ইসলামে প্রতিটি সন্তান তার পিতামাতার সাথে সদাচরণ, সুসম্পর্ক ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নির্দেশিত। এটি একজন নারীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বোধ ও আত্মমর্যাদা বির্সজনেরও শামিল।

সুতরাং এসব যৌক্তিক কারণেও আমাদের কর্তব্য, নিজের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত করার পাশাপাশি বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার এবং স্বামীর নামকে নিজের নামের অংশ বানিয়ে নেয়ার বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে সরে আসা।

যাহোক, অজ্ঞতা বা অসতর্কতাবশতঃ জাতীয় পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি সরকারি-বেসরকারি কাগজপত্রে এভাবে নাম যুক্ত হয়ে থাকলে তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এতে খুব বেশি সমস্যা বা ঝামেলা হলে বা চেষ্টা করার পরও অসম্ভব হলে ওভাবে থাকলেও গুনাহ নেই। কারণ আল্লাহ বান্দার উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। তবে এমন অজ্ঞতা সুলভ কাজের জন্য লজ্জিত হৃদয়ে মহান আল্লাহর নিকট তওবা করার পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য, যেন পরবর্তীতে নিজের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে এমনটি না ঘটে। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার নিয়ত সম্পর্কে অবহিত এবং ক্ষমাশীল। –আল্লাহু আলাম। ❑

সমাজচিন্তা

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আমাদের কী করা দরকার?

–এম এ মতিন*

বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল কল্যাণমুখী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণিত করতে হলে জনশক্তি উন্নয়ন অপরিহার্য। জনশক্তি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে গুণগত শিক্ষা। এজন্য আমাদের দেশে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিক্ষার পরিমাণগত দিকের চেয়ে গুণগত মানের দিকের অধিক নজর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। গুণগত শিক্ষা একুশ শতকের একটি অন্যতম চাওয়া।

কিন্তু গুণগত শিক্ষা বলতে কী বুঝায়? জাতিসংঘ এর সদস্য দেশসমূহের জন্য ২০১৬-২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [Sustainable Development Goals (সংক্ষেপে এসজিডি)] নির্ধারণ করে দিয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল প্রতিটি সদস্য দেশকে এর বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য প্রতি বছরই এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের প্রতিবেদন প্রতিটি দেশকে দাখিল করতে হয় এবং এগুলো জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট শাখা মূল্যায়ন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের জন্য আগামী ২০২৬ (করোনার জন্যে এক বছর বাড়িয়ে ২০২৭ করা হয়েছে) সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের সনদ লাভের জন্য আলাদাভাবে প্রয়োজনীয় সকল চলকের [গ্রস ন্যাশনাল ইনডেক্স (জিএনআই), হিউম্যান এসেটস ইনডেক্স (এইচএআই) এবং ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স (ইভিয়াই)] উপর অর্জিত ফলাফল (উপাত্ত) দাখিল করতে হচ্ছে। সুতরাং দু'টি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা অর্জনই প্রকৃত অর্থে গুণগত শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বলা হয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনশীল ও প্রয়োগিক করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী এবং শিক্ষার বিভিন্নস্তরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সামর্থ্য করে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সর্বস্তরে গুণগত পরিবর্তন সাধন করা।

*উপদেষ্টা, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ও প্রক্টর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪১ এবং প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা।

গুণগত শিক্ষা এমন একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে একজন পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন প্রতিটি শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং স্কুলের লব্ধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। যেখানে প্রতিটি শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান থাকবে। প্রতিটি শিশু একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে, উন্নত জীবনের চর্চা করবে। শিখন পরিবেশ হবে ভীতিহীন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণ করবে ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজের কাজে সম্পৃক্ত হতে শিখবে। যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের সংস্পর্শে শিক্ষার্থীরা আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে। তারা কর্মজীবনের জন্য তৈরি হবে এবং বৈশ্বিক পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

গুণগত শিক্ষা হবে একীভূত যেখানে সকল ধরনের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে অতি মেধাবী, ক্ষীণ বুদ্ধি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, দলিত জনগোষ্ঠী যেমন পড়তে পারবে তেমনি বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন পরিচালিত হবে। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে [Millennium Development Goals (MDG)] টেকসই রূপদানের লক্ষ্যে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি ঘোষণা করেছে। এসজিডি'র মোট ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪ নং লক্ষ্য হচ্ছে গুণগত শিক্ষা। অর্থাৎ- উন্নয়নশীল সকল দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ৪ নং লক্ষ্যে বর্ণিত গুণগত শিক্ষার সকল চাহিদা পূরণ করবে। গুণগত শিক্ষার আওতাধীন লক্ষ্যমাত্রা ৪ এ কী কী উপাদান অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে জাতিসংঘ প্রকাশিত ডকুমেন্ট থেকে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

এস ডি জি'র লক্ষ্যমাত্রা- ৪ :

৪.১. ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

৪.২. ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা;

৪.৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

৪.৪. চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো;

৪.৫. অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো;

৪.৬. নারী ও পুরুষসহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা;

৪.৭. অপরাপর বিষয়ের পাশাশাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

৪.ক. শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধি) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিশুদের জন্যে শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা;

৪.খ. উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিসহ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো; এবং

৪.গ. শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা। *[উৎস : জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন ডকুমেন্ট]*

গুণগত শিক্ষার উপাদান : জাতিসংঘ প্রদত্ত এসজিডি'র লক্ষ্যমাত্রা ৪ এর উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে গুণগত শিক্ষার যে উপাদানগুলো আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় সেগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে–

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের পর্যাপ্ততা, যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, মানসম্মত শিখন সামগ্রী ব্যবহার, শিখন-শেখানো পদ্ধতির ও কৌশলের কার্যকর ব্যবহার, নিরাপদ ও সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ, উপযুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সুসম্পর্ক, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা, অহিংসামূলক পরিবেশ, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধা।

এস জি ডি কর্তৃক নির্ধারিত গুণগত শিক্ষার উপরোল্লিখিত উপাদানগুলো বাস্তবায়নের জন্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষা সরঞ্জামের সাথে যে উপাদানটি সবচেয়ে জরুরি সেটি হলো উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ। শিক্ষকের সাথেই গুণগত শিক্ষার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যতবেশি উন্নত সে দেশ ততবেশি উন্নত। আর এই উন্নয়নের কারিগর হলো শিক্ষক। 'শিক্ষক' এমন একটি শব্দ যে শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, অন্তহীন ত্যাগ, মূল্যবোধ, আদর্শবান, অনুপ্রেরণাদানকারী, শুদ্ধতা, সহায়তাকারী ব্যক্তিত্বের একটি ছবি আমাদের সামনে ভেসে উঠে। শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, একটি ব্রত। শিক্ষকতা পেশাকে যেসব দেশ সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে সেসব দেশ দ্রুত সময়ে এগিয়ে গেছে।

শিক্ষকদের বেতন : ভালো শিক্ষক, ভালো ছাত্র, ভালো পাঠ্যসূচি, ভালো অবকাঠামো, ভালো গ্রন্থাগার, ভালো খেলার মাঠ, উপযুক্ত সহপাঠসূচি নিশ্চিত করা গেলেই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মান বিশ্বমানের হবে বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু সেই সাথে শিক্ষকদের ভালো বেতন ও উন্নত সামাজিক মর্যাদা প্রদানের কথা অনেকেই বেমালুম ভুলে যান। এসজিডি'র লক্ষ্যমাত্রায় আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির কথা বলা হলেও এর পূর্বশর্ত যে শিক্ষকদের স্বদেশে প্রচলিত ক্রয়ক্ষমতা [(Purchase Power Parameter (PPP)] বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বেতনভাতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। অতি সম্প্রতি আমদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এন সি টি বি) যে আধুনিক পাঠসূচি প্রণয়ন করেছে যা জাতীয়ভাবে কিছুটা বিরোধিতার মুখোমুখিও হয়েছে। তার স্বপক্ষে প্রণয়নকারীদের পক্ষে বলা হয়েছে যে, এই শিক্ষাক্রম ফিনল্যান্ড, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের পাঠক্রম অনুসরণ করে করা হয়েছে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, জাপান, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতের পাঠক্রম অনুসরণ করে একটি পাঠসুচি প্রণয়ন করা খুব বেশি কঠিন নয়। উল্লিখিত দেশসমূহ ভ্রমণ না করেও তাদের দেশের পাঠক্রম অনুসরণ ও অনুকরণ করে সহজেই একটি পাঠক্রম রচনা করা যেতে পারে। সমস্যা হলো সেটি বাস্তবায়ন। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চালিকা শক্তি হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষকদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান রেখেই বলছি– আমাদের শিক্ষকদের (কিছু শিক্ষক বাদে) যোগ্যতা কি ফিনল্যান্ডের, জাপানের এমন কি ভারতের শিক্ষকদের সমান?

যদি সত্যিকারভাবে তা না হয় তাহলে, সে সব দেশের অনুরূপ পাঠক্রম আমাদের শিক্ষকরা বাস্তবায়ন করবেন কিভাবে?

এখানে আমাদের শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। এ কথা সত্য যে, বিনামূল্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ কাজ করতে চায় না। এটাই মনুষ্য স্বভাব। সেজন্য যারা চাকরি করেন তাদের কাছে 'বেতন' শব্দটির আবেদন অনেক। 'বেতন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মজুরি, পারিশ্রমিক বা কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকা। অর্থাৎ- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ বা পরিশ্রম করার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পর একজন কর্মী/শ্রমিক যে পারিশ্রমিক বা আনুতোষিক লাভ করেন, তাই বেতন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ বেতনের বিনিময়ে কাজ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ কেউ করবেন কি না, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে 'ওই কাজের পারিশ্রমিক কত', তার ওপর। কাজটির পারিশ্রমিক যত বেশি হবে, ততই সেটির দায়িত্ব মানুষ কাঁধে নিতে চাইবে। অর্থাৎ- ভালো বেতনে কাজ করার প্রবণতা মানুষের একটা জন্মগত স্বভাব। জন্মগতভাবেই মানুষ যেহেতু কোনো কাজের বিনিময়ে কিছু মূল্য পেতে চায় এবং বেশিমূল্যের কাজের প্রতি আগ্রহ বেশি, সেহেতু সম্মানিত শিক্ষকেরাও তাঁদের জ্ঞান বিতরণের বিনিময়ে একটা সম্মানজনক ও প্রত্যাশামাফিক মজুরি পেতে চান।

পরিতাপের বিষয় হলো– বাংলাদেশের সব পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খুবই অপ্রতুল। আমাদের শিক্ষকেরাও চান আর দশজন পেশাজীবীর মতো তাঁরাও যেন ভালো বেতন পান। একজন চিকিৎসক, একজন প্রকৌশলী, একজন প্রশাসক কিংবা একজন ব্যাংকার উচ্চমানের বেতন পাচ্ছেন। অথচ শিক্ষকরা নিজেরাই এই সব প্রকৌশলী, চিকিৎসক, প্রশাসক কিংবা ব্যাংকার তৈরির কারিগর হয়েও তাঁদের তুলনায় কম বেতন পাচ্ছেন! তাই যেসব শিক্ষকের সুযোগ থাকে চাকরি পরিবর্তন করার, তাঁরা 'শিক্ষকতা' নামক মহান পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যান।

আমাদের দেশে এখনও সামাজিক বিচারে শিক্ষকদের সম্মানের চোখে দেখা হয় বটে কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক মর্যাদার বিচারে শিক্ষকরা প্রথম সারিতে তো নেই-ই; বরং দ্বিতীয় শ্রেণির পরে তাদের অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা নানা কারণে তাও অনেকটা গুরুত্ব পান কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সে তুলনায় অনেকটা উপেক্ষিত। অথচ একটি রাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ভিত গড়ে তোলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তারা সে কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের ঠিকমতো গড়ে তুলতে পারবেন না। সুতরাং যে কোনো বিচারে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা হওয়া উচিত সম্মানজনক।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শেষ পে-স্কেল অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির চাকরিজীবীদের তালিকায় শিক্ষকদের মধ্যে আছেন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক। প্রথম শ্রেণির চাকরিজীবীদের এই তালিকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা নেই। শিক্ষকদের এত কম বেতন আর এমন মানবেতর জীবন বিশ্বের উন্নত কোনো দেশে দেখা যায় না। আমরা যদি ইউরোপের উন্নত দেশ ফিনল্যান্ডের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে যে সেখানকার শিক্ষকদের বেতন অন্যদের চেয়ে বেশি এবং শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা সেখানে সর্বোচ্চ। বেতন ও সামাজিক মর্যাদা সর্বোচ্চ হওয়ায় সে দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আসেন। আর আমাদের দেশের চিত্র ভিন্নতর। চাকরির শুরুতেই সরকারি প্রাইমারি স্কুলের একজন সহকারি শিক্ষকের বেতন হয় ১৩ তম গ্রেডে। যেখানে শুধুমাত্র বেসিক বেতন থাকে ১১ হাজার থেকে ২৬ হাজার ৫৯০ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ- চাকরির শুরুতে বেসিক বেতন হবে ১১ হাজার টাকা, এরপর সময়ের সাথে সাথে বেড়ে দাঁড়ায় ২৬ হাজার ৫৯০ টাকা পর্যন্ত। সহকারী শিক্ষকরা বাড়ি ভাড়া পান মূল বেতনের ৬০ শতাংশ, অর্থাৎ- কমপক্ষে ৬ হাজার ৬০০ টাকা। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সহকারী শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ৫০ শতাংশ।

এর বাইরে দেশের বাকিসব অঞ্চলের জন্য বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ মূল বেতনের ৪৫ শতাংশ। সহকারী শিক্ষকদের অন্যান্য নিয়মিত ভাতার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা, টিফিন ভাতা ২০০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৩০০ টাকা। এই হিসাবে চাকরির একদম শুরুতে প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের মোট বেতন হয় ঢাকা সিটি এলাকায় ১৯ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যান্য সিটি এবং সাভার পৌর এলাকায় মোট ১৮ হাজার ৫০০ টাকা। এর বাইরে অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষকদের মোট বেতন ১৭ হাজার ৯৫০ টাকা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি পায় ৫% হারে। সেই সাথে উৎসব ভাতা পান ২টি করে।

এখানে আমরা বাংলাদেশের প্রথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সাথে উন্নত ২/১টি দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শিক্ষকদের মাসিক বেতনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরছি।

ফিনল্যান্ডের একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন বাংলাদেশি মুদ্রায় ২ লাখ ৯১ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৭০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। অথচ বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষক মাত্র ১২ হাজার ৫০০ টাকা বেতনে চাকরিজীবন শুরু করেন! আরেক উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বেতন বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা থেকে ৪ লাখ ৯১ হাজার ৭০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। উচ্চবেতনের পাশাপাশি সেখানকার শিক্ষকদের

সামাজিক মর্যাদাও অনেক বেশি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন আমাদের চেয়ে ঢের বেশি।

শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা : বিশ্বে অনেক দেশ আছে, যেখানে শিক্ষকদের মর্যাদা সবার উপরে। উদাহরণ হিসেবে জার্মানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি একদিকে যেমন সমাজ নির্ধারণ করে, তেমনি নির্ধারণ করে রাষ্ট্র। যারা শিক্ষা ও শিক্ষককে যত বেশি গুরুত্ব দেয়, তাদের উন্নতি তত দ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এও সত্য যে, সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে মর্যাদা জোর করে বা বলেকয়ে আদায় করা যায় না; কাজের মাধ্যমেই তা আদায় করতে হয়। আমাদের দেশে একসময় শিক্ষকদের যে রকম শ্রদ্ধার আসনে দেখা হতো বর্তমান অবস্থা সে রকম নয়। এজন্য শিক্ষকরাও দায়ি। শ্রেণিকক্ষে না পড়ানো, ঠিকমতো ক্লাসে না আসা, প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া, নানা ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে পড়া, ইত্যাদি কারণে শিক্ষকরা তাদের আগের অবস্থান হারিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ শিক্ষককে এ রকম অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না, তবে জনমানসে একবার খারাপ ইমেজ গড়ে উঠলে সেটি দূর করা কঠিন। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের দরদ দিয়ে ও দক্ষতার সঙ্গে পড়ানোর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এখনকার শিক্ষকরা অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ পান। সেসব প্রশিক্ষণ তাদের কতটুকু দক্ষ করতে পেরেছে, তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। অথচ বিশ-ত্রিশ বছর আগের শিক্ষকরা এত প্রশিক্ষণ পেতেন না বা তারা হয়তো এতটা দক্ষও ছিলেন না; কিন্তু পড়ানোর প্রতি তাদের দরদ বা নিষ্ঠা নিয়ে খুব কমই প্রশ্ন তোলা যায়। সুতরাং শিক্ষকরা যে তাদের মর্যাদার অবস্থান হারিয়েছেন, এতে শুধু রাষ্ট্রীয় বা শিক্ষাব্যবস্থার দায় দেখলে চলবে না– শিক্ষকদের নিজেদের ঘাটতিটুকুও বিচার্য।

একটি শিক্ষিত, উন্নত ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে হলে প্রখর মেধা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। তবে মেধাবীরা তো এমনি এমনিই শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হবেন না। এ জন্য তাদের ভালো বেতন ও উন্নত সামাজিক মর্যাদা প্রদান করতে হবে। ভালো বেতন ও উন্নত সামাজিক মর্যাদাই হতে পারে 'শিক্ষকতা' নামক কাজের শ্রেষ্ঠ বিনিময়।

শিক্ষকরা বর্তমানে যেটুকু বেতন পাচ্ছেন তা কি বাজার দর অনুযায়ী তাঁদের পিপিপি কি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য? সেই সাথে তাঁদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট? একজন শিক্ষককে যখন পরিবারের সদস্যদের রুটি-রুজির চিন্তা করতে হয়, তখন তিনি তো প্রাইভেট পড়ানোর কথা চিন্তা করবেনই। এ ধরনের অবস্থায় তাদের জোর করে প্রাইভেট পড়ানো থেকে বিরত রাখার উপায় বের করা হলে তারা রোজগারের অন্য কোনো উপায় বের করবেন। বিদ্যালয়ে পড়ানোর যাবতীয় ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত পুরোপুরি কার্যকর হবে না যতক্ষণ শিক্ষককে বেতনের দিক দিয়ে নির্ভার না করা যায়। চলমান পে-স্কেলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকরা বলার মতো বেতন পেলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এখনও করুণ। শিক্ষকতা পেশায় থেকে তারা সমাজে সম্মান নিয়ে চলতে পারেন না। টাকার অভাবে তারা একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে পর্যন্ত যেতে পারেন না। সংসারের খরচ মেটাতে পারেন না। আত্মীয়স্বজনের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াতে পারেন না। ভালো কাপড় কিনতে পারেন না বলে তাদের বেশভুশায় দীনতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে শিক্ষক সমাজ মানসিকভাবে আরও বেশি অসহায় ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। অগত্যা সুযোগ পেলেই তারা অন্য চাকরিতে চলে যান!

বেতনের সঙ্গে যেহেতু অনেক বিষয় সম্পৃক্ত, তাই শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে বেতনের বিষয়টিকে আলাদা করা প্রয়োজন। বেতন স্কেল কখনও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত নয়। তাই শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে দেখা প্রয়োজন। কারণ তারা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলেন, মানুষের মধ্যকার মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুলতে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন। অন্তত সে হিসেবে বিবেচনা করলেও শিক্ষকদের বেতন স্কেল হওয়া উচিত ভিন্ন বা আলাদা। আর সেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতেই বেতন নির্ধারণ করা উচিত। এক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতনক্রম আলাদা করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ- মাস্টার্স পাস একজন শিক্ষক প্রাথমিকে যে বেতন পাবেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও সমমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষক একই বেতন পাবেন। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের উচ্চতর পর্যায়ে কাজ করার, নেতৃত্ব দেওয়ার, পড়াশোনার সব সুযোগ উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। যদি এমন করা সম্ভব হয় কেবল তখনই আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো শিক্ষক পাব। আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ভালো শিক্ষক পাঠদান করলে শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তন হতে বাধ্য। তখন হয়তো দেখবো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৯০% পরীক্ষার্থী পাস করবেন (বর্তমানে ১০% পাস করেন)। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে নন-ক্যাডারদের প্রথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষক হিসেবে নেয়া যায় কি-না বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়ও শিক্ষকদের সামনের সারিতে রাখা প্রয়োজন। যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা শিক্ষকদের হাতে তৈরি। শিক্ষককে সম্মান ও মর্যাদা দিলে রাষ্ট্র কিছু হারাবে না; বরং তাদের সম্মান দিয়ে রাষ্ট্র সম্মানিত হবে। একেকজন শিক্ষক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাদের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের পরিবর্তন যত দ্রুত ঘটানো সম্ভব, তেমনটি অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। শিক্ষকরা নিজেরা যেমন নিজের সীমাবদ্ধতা কাটাতে চেষ্টা করবেন; তেমনি রাষ্ট্রও শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে নিয়ে যাবে এ প্রত্যাশাটুকু শিক্ষক হিসেবে করতে চাই। ❑

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় শতভাগ পাস-ফেল করা প্রতিষ্ঠানের পেছনে থাকতে পারে যে সব কারণ

–মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম*

২০২৪ সালে এস এস সি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, ১২/৫/২০২৪ ইং তারিখে রবিবার। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিল ২০ লাখ ৩৮ হাজার ১৫০ জন। এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৯ লাখ ৯৯ হাজার ৩৬৪ জন, আর ছাত্রীর সংখ্যা ১০ লাখ ৩৮ হাজার ৭৮৬ জন। পরীক্ষা শুরু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি-২০২৪, আর শেষ হয় ১২ মার্চ ২০২৪। সারাদেশে ১১টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে, ২৯ হাজার ৭৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৮৬১টি।

কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৭০০টি, আর বিদেশে কেন্দ্র ছিল ৮টি। মূলত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন। ফলাফল প্রকাশিত হয় ৬০ দিনের মধ্যে। এবারে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৪ শতাংশ। সারাদেশে মোট পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন। জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ১৩৯ জন। কোনো শিক্ষার্থীই পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫১টি। শতভাগ পাস করেছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ হাজার ৯৬৮টি।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৯২.৩২ শতাংশ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ৮৯.৩২ শতাংশ, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ৮৯.২৬ শতাংশ, বরিশাল ৮৯.১৩ শতাংশ, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে ৮৪.৯৭ শতাংশ, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ৮২.৮০ শতাংশ, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ৮৯.২৩ শতাংশ, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড ৭৮.৪৩ শতাংশ, সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ৭৩.৩৫ শতাংশ, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৭৯.৬৬ ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ১৮.৩৮ শতাংশ। ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি তাদের অবস্থা কি হবে? এটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। ৫১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠানের খবর জানা গেছে, একটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে, আরেকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। যা আজ পর্যন্ত বিলের কোনো আলো দেখিনি, শিক্ষকরা এ পর্যন্ত কোনো বেতন পাননি, সেই প্রতিষ্ঠানের ফলাফল শূন্য।

দেশের গ্রাম বাংলায় অজ পাড়াগাঁ, নিগূঢ় পল্লী, কোথাও বা হাওর, বাঁওড় কোথাও বা চরাঞ্চল কোথাও বা পাহাড়ের উপত্যকা, কোথাও বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, হয়তো বা বিদ্যুৎহীন অবস্থাও রয়েছে অনেক অঞ্চল। শিক্ষা দীক্ষা বুঝে না, শিক্ষার প্রতি তাদের কোনো কদর নেই, নেই গুরুত্ব, শিক্ষা অর্জন করে বড়ো হওয়া যায়, চাকরি পাওয়া যায়, এ চিন্তা চেতনাও তাদের ভেতর নেই, এমনও বিবিধ অঞ্চল রয়েছে। সেখানে হয়তো কালক্রমে কেউ না কেউ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তার নেতৃত্বে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান গড়লেই অতি সহজেই তাড়াতাড়ি সরকারি বেতন পাওয়া যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার পর ৫ বছর ১০ বছর ১৫ বছর ২০ বছর ২৫ বছর ৩০ থেকে ৪০ বছর পরেও বেতনভুক্ত হয়েছে অথবা হয়নি। এমন প্রতিষ্ঠান আছে প্রমাণ পাওয়া যায়, পত্র পত্রিকার মাধ্যমে। সেখানে শিক্ষার্থীর স্বল্পতা, শিক্ষার আগ্রহও প্রায় শূন্য, নিজেদের জীবন জীবিকার তাগিদে, নিজের জীবনের বেকারত্ব ঘোচাতে, নিজেদের উদ্যোগে মানুষের সহযোগিতায়, নিজে অর্থ দিয়ে টাকা দিয়ে জমি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। কিন্তু যখন ৫-১০-২০-২৫ ৩০ বছর বেতন হয় না, তখন অনেকেই সংসারের দায়িত্বের ভারে হতাশ হয়ে পড়েন। প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিতে বা যেতে অনীহায় বাধাগ্রস্ত হয়। অনেকেই অভুক্ত, বেতনবিহীন অবস্থা থেকেই অবসরে চলে যান বেতন না পেয়ে খালি হাতে নিরুদ্দেশের দিকে। অনেকেই নিয়োগ পেয়েও প্রতিষ্ঠানে না এসে জীবন জীবিকার তাগিদে অন্য পন্থা অবলম্বন করেন। এমনকি প্রতিষ্ঠানের কোনো খবরও রাখেন না, তবুও কিন্তু আশায় বুক বেঁধে রাখেন, যদি একদিন বেতন বা এমপিওভুক্ত হয় তাহলে আবারো ফিরে আসবেন। এইতো নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার কিছুটা বাস্তবতা। দু'একজন শিক্ষক এমন থাকেন, যারা নিজের অর্থ দিয়ে টাকা দিয়ে গরিব অসহায় দুঃখীদের ভিতর থেকে ২-১ জন শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন এবং ফরম ফিলাপ করে দিয়ে কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে থাকেন। যদি কোনো

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মুহাম্মদিয়া বল্লা ফাজিল মাদ্‌রাসা, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।*

একদিন বেতনভুক্ত হয় সে আশায়। ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী তারাই, যারা কোনোদিন পড়াশোনা করবে না, পড়াশোনা করতে চান না, লেখাপড়ার প্রতি একেবারে উদাসীন তাদের বাবা-মা ও চান না যে, তার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করুক। গ্রামাঞ্চলে কেউবা নাবালকই বিয়ে হয়েছে, কেউবা স্বামীর ঘরে চলেও গিয়েছে, কেউবা বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, বাসা-বাড়িতে কাজ করছে, কেউবা রাজমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রির জোগান দিচ্ছে, কেউবা বিদেশে পাড়ি জমাবে এমনি পরিস্থিতির ভিতরে আছে, এমন শিক্ষার্থীরা ঐ ধরনের অচল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে থাকে। তারা যখন পরীক্ষায় অংশ নেয়, পাস ফেলের বিষয়টিও তাদের কাছে খুব একটা গুরুত্ব পায় না, এমন শিক্ষার্থী বেশিরভাগই ঐ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা পড়াশোনা করে থাকে। অতএব তাদের ফেল করাটাই স্বাভাবিক, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের দু'একজন পাসও করে থাকে, যেখানে শিক্ষকদের বেতন নেই, সেখানে স্বভাবতই এমন পরিস্থিতি হতে পারে বা হচ্ছে। এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে শিক্ষার্থীরা যেমন পড়াশোনা করতে চান না তাদের অভিভাবকদেরও আগ্রহ তেমন নেই। আমরা শিক্ষকদের সাথে অনেক সময় যোগাযোগ করে শুনেছি, বারবার অভিভাবকদের ডেকে এনে এ বিষয়টি জানালেও তারা এতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। এমন কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে হাজার চেষ্টা করেও তাদেরকে ক্লাসমুখী করা যায় না। আবার এমন কিছু অসহায় শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদের বাড়ি-ঘরে গেলে দেখা যায় তাদের লেখাপড়ার কোনো পরিবেশ মোটেও নেই। না আছে টেবিল চেয়ার! না আছে লেখাপড়ার কোনো উপযোগী পরিবেশ, না আছে শোয়ার বা বসার কোনো পরিবেশ, অন্যদিকে লবণ আনতে পান্তা ফুরায়। তাদের ধারণা কিসের লেখাপড়া কিসের কি, শিক্ষকদের চাপের মুখে তাদের সহযোগিতায় রেজিস্ট্রেশন ফরম ফিলাপ করে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তারা স্বভাবতই অকৃতকার্য হয়ে থাকে। এতে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, যত দোষ নন্দ ঘোষ। সবকিছুই শিক্ষকের উপর এসে বর্তায়। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে, যে সকল প্রতিষ্ঠান ফলাফলে নীল, সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়ার দাবিও তোলা হয়। অনেক সময় বেতন বন্ধ করে শাস্তিও দেওয়া হয়। আর যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতনভুক্ত হয়নি, এমনকি প্রয়োজনীয় শিক্ষকও নেই, সেখানকার ফলাফল ভালো কখনো হবে না বা আশাও করা যায় না।

অনেক প্রতিষ্ঠানে ফলাফল নীল, সে প্রতিষ্ঠানে ঘর নেই, দরজা নেই, জানালা নেই কোনো কিছুই নেই, কিন্তু জমি তো আছে! নেই কেন, সেটাতো ভুয়া কিছু নয়। কারণ যেখানে এমপিও ভুক্তই হয়নি, বেতনও নেই, সরকারি কোনো বিল্ডিং ও পাননি, নিজের অর্থ দিয়ে যা কিছু করা হয়েছিল বাঁশের খুঁটি টিনের চালে, দীর্ঘ ২০-৩০ বছরে, ঝড়ে বাদলে বৃষ্টিতে বাতাসে উইপোকাতে, সবকিছুই তছনছ করে দিয়েছে, সেখানে প্রমাণ করতে গেলে ঘর দরজাটাই বা পাবে কোথায়! সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে। দেশের অনেক নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের প্রশংসা বা বাহবার কোনো শেষ নেই, হাজার হাজার শিক্ষার্থী এ প্লাস, এ পেয়েছে, শতভাগ পাস করেছে।

ভালো কথা, সুনামের কথা সুখ্যাতির কথা। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন কি? ওখানে কারা পড়াশোনা করে! ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে যারাই পড়াশোনা করে, নিশ্চয়ই তারা প্রভাবশালী, অর্থশালী, বিত্তবান, সচেতন অভিভাবকদের সন্তান। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে একটি শিক্ষার্থীর বেতন প্রতি মাসে কত, সে খবর নিশ্চয়ই আপনাদের সকলের জানা। শিক্ষকদের সরকারি বেতনের বাইরে তাদের বেতন কত? তা কি ভেবেছেন! প্রতিটা শিক্ষার্থীর জন্য প্রতি সাবজেক্টের জন্য একজন করে শিক্ষক প্রায়ই নিয়োগ করে থাকেন বলে আমরা শুনতে পাই। এরপরেও কোচিং প্রাইভেট নিজস্ব টিউটর তো রয়েছে। তাদের অভিভাবকরা যেমন সচেতন, তাদের সন্তানরাও নানাভাবে সহযোগিতা পেয়ে মেধাবি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বাছাই করা ভালো ভালো মেধাবী ছাত্রদেরকে ভর্তি করানো হয়, তাতে রেজাল্ট স্বভাবতই ভালো।

একজন চাষা, দিনমজুর জেলে তাঁতি কুমারের ছেলে নিগূঢ় পল্লীতে বসবাস করে, তাদের লবণ আনতে পান্তা ফুরায়, খাতা থাকলেও কলম থাকে না পড়ার কোনো পরিবেশ পায় না, তাদের কষ্টের জীবনে, ভালো ফলাফলের আর কতটুকু আশা করা যায়! সরকারি আধা সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতা যোগ্যতা সনদগত দিক থেকে একই। শুধুমাত্র পরিবেশগত ঘাটতি রয়েছে।

গ্রাম, চরাঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, নিগূঢ় পল্লীতে, শিক্ষার্থী ভর্তি করার সময় বাছাই করার কোনো ধরনের সুযোগ নেই। সেখানে মেধাবী, কম মেধাবী মধ্যম মেধাবী সব

ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে পড়ার সুযোগ দিতে হয়, বাছাই করার কোনো সুযোগ নেই এবং করাও যাবে না। তাই তাদের ফলাফলও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

নামিদামি, প্রভাবশালী অভিভাবকদের সন্তানের মতো আর ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মতো, গ্রামাঞ্চল চর হাওর বাওড়ের প্রতিষ্ঠানের ফলাফল ভালো করা সম্ভব এই জন্যই হচ্ছে না। লক্ষ্য করছি শিক্ষার্থীরা বেতন তো দিতেই চান না বা দেন না, এমনকি রেজিস্ট্রেশন ফরম ফিলাপের টাকাটাও পর্যন্ত দিতে চান না বা দিতে পারেন না। রেজিস্ট্রেশন ফরম ফিলাপের সরকারি টাকাটাও শিক্ষকদের নিজেদের দিয়ে তাদেরকে পার করে দিতে হয় –এই হলো গ্রাম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থা। এই সকল দুর্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের, কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করলে, সেটাও অনেক সময় বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়াও নামিদামি উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকরাও, গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসতে চান না বা থাকতে চান না। অন্যান্য কারণও যেমন রয়েছে, এনটিআরসি আসার পূর্বে বা পরেও কমিটি কর্তৃক নিয়োগেও যথেষ্ট অবহেলা ছিল। উৎকোচ বা ঘোষ নিয়ে, অযোগ্য অনেক শিক্ষক তারা নিয়োগ করেছেন বলে অনেক সময় পত্রপত্রিকায় দেখা গেছে, ভালো ফলাফল না হওয়ার এটাও একটা অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয়। অনেক সময় দেখা গেছে উচ্চ শিক্ষিত ভালো রেজাল্টধারী শিক্ষকগণ দরখাস্ত করলেও, তাদেরকে মূল্যায়ন না করে নিম্নমানের ফলাফলধারী প্রার্থীদেরকে নিয়োগ প্রদান করেছে বলেও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন প্রধান নিয়োগ করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক রেজাল্টধারী শিক্ষকগণ ঐ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য প্রার্থী হয়েছে কিন্তু পেশী শক্তিতে তাদেরকে নিয়োগ করা হয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় প্রধান এবং সহকারী প্রধানদের মধ্যে গড়মিল রয়েছে এতে করেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলাফলে বিঘ্নতা ঘটছে। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সদস্য শিক্ষিত মানুষ বলতেই পাওয়া যায় না বা আসেন না, যারা আসেন তাদের আবার শিক্ষা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এমন সদস্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠানে এসে যখন নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এটাকে একটা সুযোগ মনে করে দায়িত্বে অবহেলার পরিসীমাকে বাড়িয়ে দেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয় এবং ভালো ফলাফল করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

দেশের সব পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে একই ধরনের পরীক্ষা হয় না বলে গুঞ্জন রয়েছে। কোনো কোনো জেলায় উপজেলায় কোনো কোনো পরীক্ষার কেন্দ্রে, শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা ও কমবেশি রয়েছে বলে শোনা যায়। অনেক সময় অদামি বেদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সে সুযোগের সুবিধার্থে, ভালো ফলাফলের পতাকা উড্ডীন করে থাকে। এতে শিক্ষকগণ বাহবা কুড়াতে সক্ষম হন।

পরীক্ষার কেন্দ্রে দু'একটি বিষয়ে একটু কড়াকড়ি হলেই নামিদামি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও ঝরে পড়ে, দোষ দুর্নামের সবটুকু তখন গিয়ে শিক্ষকদের উপর বর্তায়। অনেক সময় দেখা যায়, জানা যায়, শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, শিক্ষকগণ আবার গুরুত্ব না দিয়ে ভুল উত্তর ক সেটের পরিবর্তে খ সেট, খ সেটের পরিবর্তে গ সেট, গ সেটের পরিবর্তে ঘ সেট, বিষয়টি ভালো করে লক্ষ্য না করে, ভুল উত্তর সরবরাহ করে শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ করে দেয়। এত করে অকৃতকার্য ফেলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় নম্বর যোগ করতে ভুল করে, এ প্লাসধারী অনেক শিক্ষার্থীকে ফেল দেখানো হয়েছে, চ্যালেঞ্জ করে সে শিক্ষার্থী তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়েছে, এমন নজির প্রতিবছর রয়েছে, একজনকে ফেল দেখানো হয়েছে পরে চ্যালেঞ্জ করে সে এ প্লাস অথবা এ গ্রেট পেয়েছে, এ মাইনাস পেয়েছে, এমন নজিরও কিন্তু রয়েছে প্রায় প্রতি বছরই কমবেশি।

আমার জানামতে একটি প্রতিষ্ঠানের সকলেই পাস করেছে কিন্তু দুইজন ছাত্রকে ফেল দেখানো হয়েছে, দুই ছাত্রের অভিভাবক এসে তার সন্তানদের নিয়ে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, আমার ছেলে তো ফেল করার মতো ছাত্র নয়? তাহলে এমন হলো কেন? পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, প্র্যাকটিক্যালের নাম্বারই যোগ হয়নি। প্রাকটিক্যালের নাম্বার পরে যোগ করে তারা দু'জনই এ গ্রেড পেয়ে গেল। যাদের লবণ আনতে পান্তা ফুরায়, সুদূর পল্লীর মানুষ, তারা যখন ফেল করে বা অকৃতকার্য হয়, তাদের চ্যালেঞ্জ করার বিষয়টি ঘুমিয়ে থাকে। তারা যদি পাসও করে থাকে, তাদের খবর কে রাখে! তাদের জীবনের অকৃতকার্য নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে, তাদের পাসের খবর কোনোদিনই আর আসবে না। কারণ তারা চ্যালেঞ্জ করতে জানে না চ্যালেঞ্জ করার মতো তাদের জ্ঞান নেই।

অনেক প্রতিষ্ঠান ভালো ফলাফল করে খুবই বাহবা নিয়ে থাকেন এমন প্রতিষ্ঠানও কিন্তু খুব অপ্রতুল নয়। নিজের ভালো ছাত্র নেই, নিজেরা পরিশ্রম করে তৈরিও করতে

পারেননি সরকারি বেতন পেলেও। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, উচ্চশিক্ষিত, মধ্যমশিক্ষিত, বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি না পেয়ে প্রাইভেট কোচিং এবং প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের তাগিদে অর্থের বিনিময়ে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে মেধাবী সন্তান তৈরি করে, মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করে, কিন্তু তাদের শিক্ষার্থীদেরকে নিজেরা সেন্ডআপ করাতে পারেন না। বিধায় অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা দেওয়ানো হয়। তারা যেমন শিক্ষার্থীদেরকে ধার দিয়ে থাকেন, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে নিজেদের ছাত্রের অভাবে তাদের ঐ শিক্ষার্থীদেরকে ধার নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফলাফল করিয়ে বাহবা নিচ্ছেন, এতে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই রয়েছে কম বেশি।

ভালো ফলাফল করার মতো অনেক প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজস্ব ভালো ছাত্র নেই বললেই চলে। অনেকটাই ধার করা শিক্ষার্থীর উপর তারা নির্ভরশীল। অনেকে হয়তো বা প্রতিবাদও করতে পারেন। বলুন তো বুকে হাত দিয়ে! ক্বওমি মাদ্‌রাসা যেখানে নবম, দশম এবং আলেম খোলা হয়েছে বা কোনো প্রাইভেট কলেজে ইন্টারমিডিয়েট খোলা হয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে কোনো অনুমোদন নেই, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মাদ্‌রাসার অধীনে বা কলেজের অধীনে তারা পরীক্ষা দিয়ে থাকে। যেহেতু তারা টাকা-পয়সা খরচ করে পড়ে নিশ্চয়ই তারা ভালো ছাত্র এবং সেখানে উচ্চশিক্ষিত অনেক শিক্ষকও রয়েছেন। বলুন তো! ঐ সকল শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীনে এবং ফলটা কিন্তু তারাই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সুনাম, সুখ্যাতির পথে। আমি বলি কার কার দরকার আমার প্রতিষ্ঠান শতভাগ পাস করেছে এতোটি এ প্লাস উপজেলায় ফার্স্ট হয়েছে, জেলায় ফার্স্ট হয়েছে। মূলত ছাত্র কিন্তু তাদের নয়, ঐ সকল প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে আসা ছাত্র। বলুনতো প্রাইভেট স্কুল এবং কলেজ যেগুলো রয়েছে সরকারি অনুমোদন তাদের নেই, প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা হাজার হাজার টাকা খরচ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, তারাও কিন্তু কোনো না কোনো স্কুল এবং কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করছে, তাদের ভালো ছাত্র অন্যেরা নিয়ে ভালো রেজাল্ট করে বাহবা কুড়িয়ে জেলায় উপজেলায় ফাস্ট হচ্ছে। বেসরকারি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজাল্ট খারাপ হলে আইনের আওতায় আনা হবে বা হওয়ার দাবিও তোলা হয়। কিন্তু একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজাল্ট খারাপ হলেও তাদের ব্যাপারে কিন্তু তেমন একটি কথা নেই। শুধুমাত্র বদলির নিয়ম কানুন প্রয়োগ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলির নিয়মকানুন নেই বিধায়, অনেক সময় তাদের বেতন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বা হয় না। কোনো না কোনো শাস্তির আভাস দেওয়া হয়, কারণ তাদের কোনো বদলি নেই। সরকারি স্কুল এবং কলেজে বর্তমানে যারা শিক্ষক নিয়োগ হন, তারা বিসিএস ক্যাডার বা নন ক্যাডার। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে সরকারি বৃত্তি পাওয়ার শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই অপ্রতুল, কিন্তু প্রাইভেটভাবে গড়ে ওঠা কেজি স্কুলগুলোতে অনেক বৃত্তি পেয়ে থাকে, তবে ঐ সকল শিক্ষার্থীরাও কোনো না কোনো প্রাইমারি স্কুলের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে নিজস্ব পরীক্ষা দেওয়ার নিয়মও এখন হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের শাস্তি হলো বদলি। সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মান কতটুকু সে বিষয় সরকারের তথ্যে অবশ্যই রয়েছে।

শিক্ষকগণ কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ এবং উচ্চতর ডিগ্রিধারী। অনেক যাচাই বাছায় হওয়ার পরে তারা শিক্ষক পদে নিয়োগ পান, সে অনুপাতে শিক্ষার্থীদের মান কতটুকু, সে বিষয়টি সকলের নজরে রয়েছে। সে বিষয় নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষক স্টাপিং প্যাটার্নে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছেন, সরকারের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই। কিন্তু যারাই আমরা শিক্ষক, দায়িত্ব পালনে কে কতটুকু সচেতন, সেটা আমরা নিজেরাই প্রশ্ন করে উত্তর বের করে নিতে পারি।

অনেক শিক্ষক এমনও রয়েছেন, রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আসল পেশা থেকে নিজেকে এড়িয়ে রাখেন, তাতে করে ক্ষতি হয় শিক্ষার্থীদের, ক্ষতি হয় দেশ এবং জনগণের। রাজনীতি এবং দলের দোহাই দিয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরে উপস্থিতি এবং সময় হওয়ার পূর্বেই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা একেবারেই অনুচিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং সরকারি বেতন শতভাগ হালাল করতে, দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভালো শিক্ষক হলে ভালো শিক্ষার্থী তৈরি হবে। ভালো শিক্ষকের আদর্শ গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা। নিজে যা করো না তা অন্যকে বলো না, আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন না। ❑

নিভৃত ভাবনা

বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিম্নমুখী অবস্থান : প্রতিকারে প্রস্তাবনা

–প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক টাইমস হায়ার এডুকেশন এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৪-এর তালিকায় শীর্ষ ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় নেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। এটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা না থাকলেও মাথাব্যথা হচ্ছে পার্শ্ব দু'টি দেশ ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে। ৩০০ এর মধ্যে ভারতের ৪০টি এবং পাকিস্তানেরও ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এটি আরো আমাদের বড়ো কষ্টের কারণ হয়েছে। কয়েকদিন থেকেই ফেসবুকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়া নিয়ে চাউর হচ্ছে এবং আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে চলছে। এ বিষয়টি নতুন কিছু নয় প্রতিবছরই আমরা এই দৃশ্যটি দেখতে পাই।

এরপর আমরা সমালোচকরা শুধু সমালোচনা করেই দায়মুক্ত হচ্ছি। কিন্তু এর কারণ এবং কারণগুলোর প্রতিকারের বিষয় আমাদের কোনো চিন্তা পরামর্শ সেভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত কারো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

আর আমরা চিন্তাবিদ চিন্তাশীল গবেষকরা একবারও আমাদের এই পিছিয়ে পড়ার বিষয় নিয়ে কখনো চিন্তা গবেষণা করি না।

আলহামদুলিল্লাহ দেশের সরকারি বেসরকারি মিলে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা এখন দেড়শতাধিক। ছোট্ট একটি দেশের জন্য এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অবশ্যই উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক। তাই সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ এর নিচে যাবে না বরং উপরেই থাকবে।

আমরা জানি যেকোনো জিনিসের মানের বিষয়টি নির্ভর করে সবসময় কোয়ান্টিটি বা সংখ্যা নয় কোয়ালিটি বা মানের উপর।

বিশ্ববিদ্যালয় মানে দেশের উচ্চশিক্ষার অনেক বড়ো একটি প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার মান উন্নয়নে জ্ঞান গবেষণা আবিষ্কার যার প্রধান কাজ। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচিতে নির্ধারিত কোনো গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত থাকে না। থাকে নির্ধারিত কিছু বিষয়।

নির্ধারিত কিছু বিষয়ের একেকটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ২-১০ লেকচার দিয়ে থাকেন। আর শিক্ষার্থীরা সেই লেকচার অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ লাইব্রেরীতে বসে গবেষণা করে টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্ট নামে ছোটো গবেষণা পত্র রচনা করে থাকেন।

স্নাতক প্রথম বর্ষেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি কোর্স-এর অধীনে টিউটোরিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট নামে ৩-৬টি পর্যন্ত এ ধরনের ছোটো ছোটো গবেষণা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে এটাই গবেষণার প্রথম হাতে খড়ি।

এরপর স্নাতক চতুর্থ বর্ষ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফিল্ড ওয়ার্ক এসাইনমেন্ট গবেষণা প্রজেক্ট এর মাধ্যমে আরো বড়ো বড়ো গবেষণাপত্র রচিত হয়ে থাকে।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পর এমফিল পিএইচডি পোস্ট ডক্টরেট নামে আরো বৃহৎ গবেষণাপত্র রচিত হয়ে থাকে। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রতিটি গবেষক ছাত্র দেশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল বিষয়ে এক একটি আলাদা অনন্যধর্মী গবেষণাপত্র রচনা করে থাকেন। যা দেশ জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের দেড়শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিজ্ঞানমুখী বিজ্ঞান চর্চা বিজ্ঞান গবেষণার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে কিসের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নির্ণয় করা হয় সে বিষয়ে আমার তত ধারণা নেই। তবে মৌলিক যে বিষয়গুলো র‍্যাঙ্কিংয়ে বিবেচনা করা উচিত সেগুলো হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা এবং আবিষ্কার। শুধু গবেষণা এবং আবিষ্কার নয় এগুলো দেশ ও মানবজাতির উন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখবে সেটাও বিবেচনায় আসা উচিত।

বিশ্বের এখন জনপ্রিয় খেলা হলো ক্রিকেট। ক্রিকেট খেলায় একজন ক্রিকেটারের তার বোলিং ব্যাটিং

* *আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

ব্যাটিংয়ে ক্যাচ ডট বল খেলার শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিবেচনা করে একেকজন প্লেয়ারকে প্রতিটি খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, ম্যান অব দ্যা সিরিজ ক্যাপ্টেন্সি ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের তার শিক্ষাজীবনে কোনো কিছুই কাউন্ট করার এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। দু'একটি বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটাও হয় না।

তাই আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজের অবস্থান করে নেওয়ার জন্য যেসব মৌলিক বিষয় নির্ধারণ করা উচিত সেগুলো হলো–

শিক্ষকের বিষয়ে প্রস্তাবনা :

১. একজন শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থিতি ক্লাসে উপস্থিতি, পাঠদান সময় পাঠদানের বিষয়বস্তু পাঠদানের উপস্থাপনা পাঠের উপযোগিতা পাঠ্য বিষয়টির মান নির্ধারণ শিক্ষার্থীদের উপযোগী বক্তৃতা বাস্তব জীবনে এই বক্তব্য কতটুকু উপকারী শিক্ষার্থীকে পথ নির্দেশনা দানে বক্তব্যটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য গবেষণার ক্ষেত্রে তার বক্তব্যটি কতটুকু কার্যকর ইত্যাদি বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রয়োজন।

২. একজন শিক্ষকের নিয়মানুবর্তিতা কর্তব্যনিষ্ঠা ছাত্রদের প্রতি স্নেহশীলতা শিক্ষার্থীদের আপন করে নেওয়ার মানসিকতা শিক্ষার্থীদের দেশ-জাতির জন্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আগ্রহ চেষ্টা শ্রম গবেষণা ইত্যাদি ও বিবেচনায় আনা।

৩. ক্লাসের বাইরে একজন শিক্ষক তার নিজস্ব কক্ষে কতজন শিক্ষার্থীকে কাউন্সিলিং করেন সুপরামর্শ দেন তার না বুঝা বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেন তাকে গবেষণামুখী করতে সহযোগিতা করেন আবিষ্কারের বিষয়ে তার প্রচেষ্টা ব্যয় করেন সেটিও কাউন্ট করতে হবে।

৪. নিজস্ব বিভাগের বাইরে অনুষদভুক্ত অন্য বিভাগ অন্য অনুষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো শ্রেণীর যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য তিনি কতটুকু শিক্ষক হিসেবে আদর্শ আইডল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে তার কথা কাজ আচার-আচরণ ব্যবহার বক্তব্য ইত্যাদি কতটুকু উপকারী সেটাও বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তার প্রভাব গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সে বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

৬. শিক্ষকের বছরে তার আর্টিকেল গবেষণা রচনা কতটুকু হয়েছে এর মধ্যে কতগুলো তার শিক্ষার্থী তার বিশ্ববিদ্যালয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশ জাতির উন্নয়নে কাজে এসেছে সে বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

৭. শিক্ষকের বিষয়ে বিভাগ অনুষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গবেষক সহকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানদের, এসেসমেন্ট আসা দরকার।

৮. একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের বক্তব্য কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো কতটুকু শিখতে পারল, পারলেও জানতে বা বুঝতে পারলো তার এই বুঝ অনুযায়ী কতটুকু সে ব্যক্ত বা বক্তব্য রাখতে পারল কতটুকু সে লিখতে পারলো কতটুকু সে হজম করতে পারলো কতটুকু সে অর্জন করে সে অর্জন অনুযায়ী দেশ জাতিকে কিছু দেওয়ার কতটুকু সক্ষমতা অর্জিত হলো এগুলো বিবেচনায় আনা উচিত।

৯. একটি শিক্ষাবর্ষে কতজন শিক্ষার্থী গবেষক লেখক উদ্ভাবনকারী উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারল কর্মজীবনে শিক্ষার্থীরা কতটুকু সফলতা কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের কী কী উন্নয়নে তার জ্ঞান গবেষণা কাজে লাগলো সেগুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

১০. গবেষণায় আগ্রহী করতে গবেষণায় সর্বোচ্চ বাজেট প্রদান।

১১. প্রতিটি গবেষণা প্রবন্ধ/গ্রন্থের জন্য একটি করে ইনক্রিমেন্ট প্রদান।

১২. সকল গবেষণাপত্র ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খরচে প্রকাশ করা।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবনা : আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাইরে আরেকটি বড়ো যোগ্যতার প্রয়োজন সেটা হলো রাজনৈতিক লিংক। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররাও নির্বাচনী বোর্ডে অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। এ বিষয়টিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অসুস্থ রাজনীতি : বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে এই অসুস্থ রাজনীতি প্রধানত দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ালেখা হলে অবস্থান পরীক্ষা এবং ফলাফলে রাজনৈতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। *[পরবর্তী অংশ ৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

কবিতা

অহংকার

মোল্লা মাজেদ★

কিসের অহংকার হে তোমার কিসের অহংকার
এক তুড়িতে গুঁড়িয়ে যাবে বক্ষ জোড়া হাড়।
মোহ-মায়ায় যতই বাঁধো
সুখের এ সংসার
সকল বাঁধন ছিন্ন করে
নামবে অন্ধকার
কোথায় সেদিন থাকবে তোমার দীপ্ত অহংকার?

হিন্দোলে দোল সিন্ধু দোলায় পাহাড় গিরি বন
ছোট্ট জীবন প্রদীপ শিখা নিবতে কতক্ষণ।
যতই থাকো অন্তরালে
নেই তো রেহাই কোনো কালে
ঘটবে যাহা লিখন ভালে
নেই কোনো নিস্তার
এই আমারি নইতো আমি বৃথাই অহংকার।

যতই করো উচ্চ ও শির
কিই বা আসে এই ধরণীর
নম্র চিতে রাখলে ও শির
মিলবে পুরস্কার
মহা পাপী অহংকারীর জুটবে তিরস্কার
জীবন পণে দলতে হবে ঘৃণ্য অহংকার।

সমাপ্ত

ফিরে এলাম

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

সুখ কোথায় দেখতে পাই না কেন?
চোখ তো ঠিকই আছে ছানি পড়েনি
কষ্টের শৈত কুয়াশায় আচ্ছাদিত ধরা
নিজেকেও অস্পষ্ট দেখছি–
আল্লাহ তা'আলা যেদিন অবনীর বিভা
হতভাগাকে দেখার সুযোগ দিলো
শয়তানের খোঁচায় কষ্টের হিমালয় আঁখির
সমুখে আচমকা দাঁড়িয়েছিল
ডরে টোয়াটোয়া স্বরে বুক ফেটে কেঁদেছি।
বিষাক্ত পবনে ডুবোডুবি করে বেড়ে উঠেছি
বিষ দিয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটায়ে চলছি অবিরাম
পাশে কেউ নেই, শূন্যতা গ্রাস করছিল আমায়
আপনজন তো কবেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে!
কতজন আপনের বেশে অস্থি ছাড়া
কিছুই বাকি রাখেনি
শুধু হাড় তো কুকুরও শুঁকেনা
নারী নাকি সুখসমুদ্র–
সেও বিজলী বেগে পালিয়ে গেছে বহুদূর
আমার গায়ে মধুর গন্ধও নেই বলে।
কেবল পুষ্পবাগান আমায় কাছে টানে
রঙ বেরঙের কুসুম বুকে তুলে নেয়
পা বাড়াই প্রিয় আত্মা হরণের পথে
গলায় রশি প্যাঁচাই–
হঠাৎ কে যেন আমার পথ আটকিয়ে দিলো
ভয়ে আতকে উঠি, মোটা কণ্ঠে শুধাই–
তুমি কে?
আমি তোমার বিবেক, যার কারণে তুমি সৃষ্টির সেরা জীব
তুমি কেন করতে চাও এতো বড়ো ভুল
কেন এসেছ ধরায়? কে পাঠিয়েছে?
পাঠালো কেন?
করেছ কী কভু ভাবনা হেন?
তুচ্ছ তুমি নও, ক্ষুদ্র কভু নও, তুমি বহু দামি
শ্রেষ্ঠ রূপে গড়েছে তোমায় অন্তর্যামী
তাঁর 'ইবাদতে পাবে তুমি সুখ
পর হিতে পাবে উচ্ছ্বাস
একালে বাঁচ যদি সবার তরে
সেকাল হবে চির শান্তির বাস।
ফিরে এলাম–
ভুল পথ ছেড়ে স্রষ্টার ঘরে
ক্ষমা যাঞ্চা করি সিজদায় লুটে পড়ে।

সমাপ্ত

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

জমঈয়ত সংবাদ

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানে দেশব্যাপী দাওয়াহ কর্মসূচি

সদ্যগত রমাযানে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর দেশব্যাপী দাওয়াহ কর্মসূচির বিবরণের প্রথমাংশ ৬৫ বর্ষের ২৯-৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

গত ৩ রমাযান মুন্সিগঞ্জ জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়ত সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী এবং প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম আব্দুল হালীম মাদানী।

গত ৫ রমাযান বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল ঢাকার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি ও বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। উপস্থিত ছিলেন সাঈদ খোকন, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গত ৭ রমাযান কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে দীন শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, অধ্যাপক ড. হেদায়েতউল্লাহ, শাইখ ড. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

গত ৯ রমাযান সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, প্রচার ও গণমাধ্যম বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ রায়হান উদ্দীন, অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ।

গত ৯ রমাযান শেরপুর জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জনসংযোগ কর্মকর্তা শাইখ উবায়দুল্লাহ মাদানী ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

গত ৯ রমাযান গাজীপুর জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী।

গত ১১ রমাযান সিলেট জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী।

গত ১৩ রমাযান ঢাকা জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

গত ১৩ রমাযান জামালপুর জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ।

গত ১৪ রমাযান টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম মাদানী, নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক মো. হেদায়তুল্লাহ।

গত ১৬ রমাযান নরসিংদী জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী ও শুব্বান প্রতিনিধি শাইখ জাহিদ হাসান মাদানী।

গত ১৯ রমাযান সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর এলাকা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী,

সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও শুব্বান কর্মী আনোয়ার হোসেন।

গত ১৮ রমাযান চট্টগ্রাম জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

গত ১৮ রমাযান নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও আহলে হাদীস তালীমী বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী।

গত ১৮ রমাযান জয়পুরহাট জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী ও শুব্বান প্রতিনিধি নাযির আহমদ।

গত ১৮ রমাযান বগুড়া জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

গত ১৯ রমাযান নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল পাঁচরুখীতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি অধ্যাপক শাইখ ফজলুল বারী খান ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন হারিছ।

২০ রমাযান শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র জনাব মো. ইদরীস মাতাব্বর ও অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম, দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসা, মিরপুর-এর শিক্ষক শাইখ নাজিবুল্লাহ ও সাপ্তাহিক আরাফাতের বিপণন কর্মকর্তা আব্দুল মুমিন।

গত ২৩ রমাযান ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী।

গত ২৭ রমাযান নেত্রকোণা জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ।

গত ২৭ রমাযান কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম আব্দুল হালীম মাদানী, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ির মুহাদ্দীস শাইখ আবু হানিফ মাদানী ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জনসংযোগ কর্মকর্তা শাইখ উবায়দুল্লাহ মাদানী।

মক্কা ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি হাফেয ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাদানী, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম উমরী এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা শাইখ আব্দুর নূর বিন আবু সাঈদ মাদানী সদ্যগত পবিত্র রমাযানে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গত ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার মক্কা এলাকা জমঈয়ত গঠন উপলক্ষ্যে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল জমঈয়তের সভাপতি শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী।

বাদ মাগরিব হারাম শরীফ মক্কার অদূরে স্থানীয় বাংলাদেশী ব্যবসায়ী মুহাম্মদ ইউসুফ-এর বাসভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কিং ‘আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী শিক্ষার্থীবৃন্দ। এ সভায় প্রথমবারের মতো ‘মক্কা ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস’-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়তের কর্মী, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সাব্বির রায়হান। এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল-মামুন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নতুন শাখার নবনিযুক্ত সদস্য সচিব শাইখ তাওহীদুল ইসলাম। মক্কা ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের আহ্বায়ক কমিটি: আহ্বায়ক- ইউসুফ আজাদ, যুগ্ম আহ্বায়ক- মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ আমানুল্লাহ, সদস্য সচিব- তাওহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা ও অনলাইন বই পাঠ প্রতিযোগিতা

গত ১৭ মে শুক্রবার বাদ মাগরিব আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তন, যাত্রাবাড়িতে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সঞ্চালনায় শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ এর কিরআত পরিচালক হাফেয আহসান হাবিবের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিম জাতির অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার শীর্ষক মাসিক আলোচনা সভার ৩৩তম পর্ব ও অনলাইন বই পাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ সফলভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার মুহাদ্দিস ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পাঠাগার সম্পাদক শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক নাজিবুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক আবু লায়েছ ফাহিম, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, পাঠাগার সম্পাদক তাকিউদ্দীন-সহ মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শাখা ও যাত্রাবাড়ি থানা শুব্বান শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সুধীবৃন্দ। রমাযান মাসে 'আহলে হাদীস পরিচিতি' বইয়ের উপর অনলাইন বই পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রথম পুরস্কার ১৫ হাজার টাকা ও ৩ হাজার টাকার সমমূল্যের বই, দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা ও ২ হাজার টাকার সমমূল্যের বই, তৃতীয় পুরস্কার ৭ হাজার টাকা ও ২ হাজার টাকার সমমূল্যের বই, চতুর্থ পুরস্কার ৫ হাজার টাকা ও ১ হাজার টাকা সমমূল্যের বই, পঞ্চম পুরস্কার ৩ হাজার টাকা ও ১ হাজার টাকার সমমূল্যের বই, ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত ১ হাজার টাকা ও ১ হাজার টাকার সমমূল্যের বই, ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত ৮ শত টাকার সমমূল্যের বই এবং ২১ থেকে ৫২ পর্যন্ত ৫ শত টাকার সমমূল্যের বই প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং অনলাইন বই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসাবে বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দু'আ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়...

[৩৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

শিক্ষার্থীদের বিষয়ে প্রস্তাবনা : ১. প্রতিটি শিক্ষার্থী হবেন আবাসিক। ২. হলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ। ৩. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য স্কলারশিপ-এর ব্যবস্থা। ৪. হলে খাবারের মান নিশ্চিতকরণ। ৫. উন্নতমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ৬. শিক্ষার্থীদের রাজনীতি মুক্ত রাখা। ৭. মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা। ৮. প্রথম স্থানপ্রাপ্ত চৌকস শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগে নিশ্চিতকরণ। ৯. গবেষণা ইন্সট্রুমেন্ট পর্যাপ্ত সরবরাহ করা। ১০. গবেষণায় পর্যাপ্ত স্কলারশিপ এর ব্যবস্থা করা।

প্রশাসনিক বিষয়ে প্রস্তাবনা :

১. পিএসসির মতো ইউজিসি কর্তৃক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ড সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের সাথে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যতার পরীক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির নামে অসুস্থ রাজনীতি বন্ধ করা।

৩. প্রয়োজনে রাজনীতির জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যেখানে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সাবজেক্ট থাকবে এবং সেখানে প্রচলিত রাজনীতি বিষয়ে যা কিছু আছে আলাদা আলাদা সাবজেক্ট সেখানে ওপেন করে সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।

৪. রাজনীতি প্রভাবমুক্ত অ্যাকাডেমিক ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা।

৫. গবেষণা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বাজেট এবং এই বাজেটের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করা।

৬. গবেষণায় যোগ্য ও আগ্রহীদের গবেষণা ক্ষেত্রে নিয়োগ করা।

৭. বিদেশি ডিগ্রি প্রাপ্তদের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমপক্ষে ১০ বছরের চাকরি বাধ্যতামূলক করা।

৮. প্রতিটি শিক্ষকের ক্লাস লেকচার প্রবন্ধ গ্রন্থ সেমিনার সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ গবেষণা তত্ত্বাবধান ইত্যাদি ডাটা সংরক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী শিক্ষকদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

৯. শিক্ষকদের গবেষণা প্রবন্ধ এবং গবেষণা থিসিসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে প্রকাশ করা।

১০. বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম সারিতে থাকে তাদের সে বিষয়গুলো আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুসরণ করা।

এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আমার বিশ্বাস শুধু এশিয়া মহাদেশে নয় বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েও আমরা ১০০-এর মধ্যে থাকতে পারবো। ❑

স্বাস্থ্য সচেতনতা

জিব দেখে বুঝে নিন শরীরে কোন রোগ বাসা বেঁধেছে

কোনো রোগ নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে অনেক সময়ই ডাক্তার প্রথম রোগীর জিব পরীক্ষা করে দেখেন। কারণ, জিব দেখেই চিকিৎসকরা রোগীর রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করতে পারেন। জিবের রংই বলে দেবে আপনি কোনো কঠিন রোগে ভুগছেন কি না।

কিছু ওষুধ রয়েছে যেগুলো সাময়িক সময়ের জন্য জিবের রং পরিবর্তন করে দেয়ে। আবার নিয়মিত পরিষ্কার না করলেও জিবের রং পরিবর্তন হতে পারে। তবে যদি দেখেন, কোনো কারণ ছাড়াই জিবের রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই সতর্ক হোন। কারণ, বিনা কারণে জিবের রং পরিবর্তন হওয়া শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার ইঙ্গিত দেয়।

এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে জেনে নিন জিবের কোনো পরিবর্তন কোন রোগের ইঙ্গিত দেয়– জিবের সাধারণ রং থাকবে হালকা গোলাপি। অর্থাৎ- আপনার জিবের রং যদি হালকা গোলাপি হয় ও ওপরে পাতলা সাদা একটি আস্তরণ থাকে, তাহলে বুঝে নেবেন আপনি সুস্থ আছেন। হালকা গোলাপি রং হলো জিবের স্বাভাবিক রং।

ডিহাইড্রেশনে ভুগলে জিব সাদাটে রং ধারণ করে। যদি আপনার জিবের রং সাদাটে ধরনের হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন আপনি খুব সম্ভবত ডিহাইড্রেশনে ভুগছেন। আবার মুখে কোনো সংক্রমণ হলেও জিবের রং সাদাটে হয়ে যায়। নিয়মিত মুখ পরিষ্কার না করার কারণে অনেক সময় এমনটি হয়। তবে জিবে যদি পনিরের মতো সাদা স্তর পড়ে, তাহলে তা লিউকোপ্লাকিয়া রোগের লক্ষণ। যার অন্যতম কারণ হলো ধূমপান করা।

জিবের রং যদি ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ বা ডায়েটে পরিবর্তন এনে এ সমস্যার সহজেই সমাধান করা যায়।

আপনার যদি হজমের সমস্যা থাকে, তাহলে জিব হলুদ রং ধারণ করবে। এছাড়াও লিভার বা পেটের সমস্যা থাকলেও জিবের রং হলদেটে হয়ে যেতে পারে।

আপনি যদি অতিরিক্ত ক্যাফেইন সেবন করেন, তাহলে আপনার জিব বাদামি রং ধারণ করতে পারে। এছাড়া ধূমপান করলেও জিব বাদামি রঙের হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে যারা ধূমপান করেন, তাদের জিবে স্থায়ীভাবে বাদামি রঙের আস্তরণ পড়ে। এমনকি এটি একপর্যায়ে কালোও হয়ে যেতে পারে। জিবে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হলে জিব কালো ও লোমশ প্রকৃতির হয়ে যায়।

অন্যদিকে ফলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি-১২-র অভাবে জিবের রং লাল হয়ে যায়। তাই যাদের জিবের রং লাল বুঝতে হবে তারা এ ধরনের সমস্যায় ভুগছেন। এ সমস্যার কারণে জিব অস্বাভাবিকভাবে লাল হয়ে যায়।

জিবের রং নীল হতে হয়তো অনেকেই শোনেননি। জিবের রং নীল হয় শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদি আপনার হৃৎপিণ্ডে সমস্যা থাকে, তাহলে জিব নীল ও বেগুনি রঙের হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই যদি আপনার জিব নীল বা বেগুনি রঙের হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন আপনার হার্ট রক্ত সঠিকভাবে পাম্প করছে না বা আপনার রক্তে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে। আর জিবের রং নীলচে হলে দেরি না করে দ্রুত ডাক্তার দেখান। পাশাপাশি জিব, দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত ব্রাশ করুন। যাতে মুখে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ না হতে পারে। জিব পরিষ্কার করতে প্রতিদিন স্ক্র্যাপার ব্যবহার করতে পারেন।

জিবের স্বাভাবিক রঙের কোনো পরিবর্তন হলে দেরি না করে যতদ্রুত সম্ভব বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

[সূত্র : সময় টিভি অনলাইন]

যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনে করণীয় ও বর্জনীয় কিছু বিষয়

১. খাঁটি মনে তাওবাহ্ করা।
২. হজ্জ ও ‘উমরাহ্ আদায় করা (সামর্থ্যবান হলে)।
৩. নিয়মিত ফর্‌য ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া।
৪. বেশি করে নেক ‘আমল করা।
৫. আল্লাহ তা‘আলার যিক্‌র করা।
৬. বেশি বেশি ও উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

৭. ০৯ তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন করা বিশেষতঃ আরাফার দিবসে।
৮. ১০ তারিখে ঈদের সালাত আদায় করা।
৯. কুরবানি করা (সামর্থ্যবান হলে)।
১০. বেশি বেশি দান করা।
১১. সর্ব প্রকার পাপ হতে বিরত থাকা।
১২. কুরবানী সম্পন্ন না করা পর্যন্ত চুল, নখ না কাটা।
১৩. ঈদ উপলক্ষে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কাজ বা আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *সূর্যোদয়ের কত মিনিট পর এশরাকের ওয়াক্ত শুরু হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।* *মো. শাকীল*
পাগলা বাজার, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : সালাতুল ইশরাক অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত সালাত। এর ফাযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

من صلى الفجر في جماعة، ثم قعَد يذكر الله حتى تطلُع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة".

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলো, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে বসে মহান আল্লাহর যিক্‌র করতে থাকলো এবং সূর্য ওঠার পর ২ রাকআত সালাত আদায় করলো, তার 'আমলনামায় একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও 'উমরাহ্'র নেকী থাকবে"– *(সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ৪৫৪; সহীহুল জামে'- হা. ৬৩৪৬)*। এক্ষণে এ সালাতের ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য ওঠা নিশ্চিত হওয়া। আর তা হলো– সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিটি পর সালাত আদায় করে নেওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন মর্মে একটি হাদীস রয়েছে। বেশি বিলম্ব করা উচিত নয়। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০২) : ***যাকাতের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। আমার ওয়াইফ এবং মেয়ের মোট এক ভরি স্বর্ণ এবং দুই ভরি রুপা আছে। নগদ কোনো অর্থ নেই। এক্ষেত্রে আমার জন্য যাকাত ফর্‌য হয়েছে কিনা এবং যদি ফর্‌য হয়ে থাকে তাহলে উক্ত সম্পদের উপর কতটুকু যাকাত আসবে। বিস্তারিত জানাবেন মেহেরবাণী করে।***

মো. সামিউল ইসলাম
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : যাকাত ফর্‌য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল থাকা আবশ্যক। এ পরিমাণকে যাকাতের নিসাব বলে। আপনার জিজ্ঞাসা মতে জানা যায় যে, আপনার স্ত্রী ও কন্যার ১ ভরি স্বর্ণ ও ২ ভরি রুপা আছে, নগদ কোনো অর্থ নেই। এমতাবস্থায় আপনার স্ত্রী-কন্যার উপর যাকাত ফর্‌য হয়নি। তাই আপনাকে বর্ণিত মালের যাকাত দিতে হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***সিয়াম পালন করা অবস্থায় প্রস্রাব করার সময় যদি বীর্যের মতো আঠালো পদার্থ বের হয় তাহলে কি সিয়াম ভেঙে যাবে?*** *মো. আল আমিন*
নওগাঁ।

জবাব : যৌন চাহিদাজনিত উত্তেজনা ছাড়া প্রস্রাবের সাথে তরল পদার্থ কিছু বের হলে আপনার সিয়াম নষ্ট হবে না। কেননা সেটি হাদীসে বর্ণিত সিয়াম ভঙ্গের কারণের মধ্যে উল্লেখ নেই। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***হাদীসের যেকোনো দু'আ রুকূ' ও সিজদায় পড়া যাবে কি? যেমন- বিপদের দু'আ, পিতা-মাতার জন্য দু'আ, ঋণমুক্তির জন্য দু'আ ও দুশ্চিন্তা দূর করার দু'আ ইত্যাদি।*** *মো. ফয়সাল মাহবুব*
চট্টগ্রাম।

জবাব : রুকূ' ও সিজদা সালাতের অন্যতম দু'টি রূকন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূ' অবস্থায় আল্লাহর বড়োত্ব বর্ণনামূলক বাক্য পড়তে বলেছেন। আর সিজদা অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

فأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فيه الرَّبَّ عزَّ وجلَّ، وأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ.

"আর রুকূ'তে তোমরা মহান ও মহিমাময় রবের বড়োত্ব বর্ণনা করো এবং সিজদায় গিয়ে বেশি বেশি দু'আয় শ্রম দাও– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭৯)*! সুতরাং সিজদা অবস্থায় হাদীসে বর্ণিত যে কোনো দু'আ পাঠ করা যাবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***সাদাক্বাতুল ফিতরা চালের পরিবর্তে সেমাই চিনি দেওয়া যাবে কি?*** *মারুফ*
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : যাকাতুল ফিত্‌র একটি মৌসুমী ফর্‌য যাকাত। আর আদায় করতে হবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী; নিজ খেয়াল-খুশি মতো আদায় করলে যাকাতুল ফিত্‌র আদায় হবে না। কী দিয়ে যাকাতুল ফিত্‌র দিতে হবে, তা হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি খাদ্যপণ্যের নাম বলে খাদ্যদ্রব্যের বিষয়টি নির্দিষ্ট করেছেন।

আর আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাল। কাজেই চাল দিয়ে ফিতরা দেয়া উচিত। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***জনৈক আলেম বলেছেন, দুই সিজদাহের মাঝে যে দু'আ হাদীসে আসে, সেটা নাকি জাল হাদীস। উক্ত আলেমের বক্তব্য কি সঠিক?*** *সিয়াম শিকদার*
চিতলমারী, বাগেরহাট।

জবাব : দুই সিজদার মাঝখানের দু'আ কম-বেশি শব্দে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সমন্বিত ৭টি শব্দে বর্ণিত দু'আ। আর তা হলো– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْفَعْنِيْ. *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৮৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৮৫০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৮৮৮)*। পক্ষান্তরে ৫ শব্দে বর্ণিত দু'আ হলো–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ.

এটি একটি সহীহ দু'আ– *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৮৮, সহীহ)*। সুতরাং হাদীসগুলো যাচাই ছাড়া জাল-য'ঈফ বলা যাবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***আমি একজন যুবক। সম্প্রতি আমার একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করেছি। এই মুহূর্তে জরুরিভাবে আমার ইনকাম সোর্স প্রয়োজন। নিজের সাধ্যমতো চেষ্টার পাশাপাশি শরীয়তসম্মত আর কি কি 'আমল আমি করতে পারি, উত্তম ইনকাম সোর্স পাওয়ার জন্য। আমাকে নাসীহাহ করবেন।*** *সাকিবুর রহমান*
রহমতপুর।

জবাব : হালাল রুযী কামাই করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। আপনি হালাল রুযীর সন্ধানে থাকুন এবং নিম্নের দু'আটি বেশি বেশি করে পাঠ করুন। আল্লাহ আপনার জন্য একটি উপায় বের করে দেবেন। দু'আটি হলো–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

"হে আল্লাহ! তোমার হালাল রিয্ক দ্বারা আমাকে তোমার হারাম হতে যথেষ্ট করে দাও! আর তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যের মুখাপেক্ষী হতে আমাকে বিমুখ করে দাও!"– *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৬৩)*। আশা করছি আল্লাহ তা'আলা আপনার রুজি-রুটির সুব্যবস্থা করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমার প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঈদের ময়দানে সালাতের খুতবার পরে মুসল্লিদের নিকট হতে মহিলাদের নিকট হতে টাকা-পয়সা সাদাক্বাহ্ দান গ্রহণ করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে ঈদের ময়দানে দান-খয়রাত টাকা-পয়সা খুতবার পূর্বে আদায় করা হয়। এটা সঠিক না ভুল দয়া করে উত্তর দিবেন?***
মাসরুর আহমাদ মাসরুর
মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ।

জবাব : আমাদের প্রতিটি 'আমল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরিকা মুতাবেক হওয়া উচিত। নতুবা তা আল্লাহ কবুল করবে না; বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুসল্লিগণের দিকে ফিরে খুৎবাহ্ দিতেন। আর মানুষেরা কাতারবন্দি হয়ে বসে থাকতো, তারপর তিনি দান করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে খুৎবাহ্ শুরু করতেন। কাজেই সালাতের আগে কোনো কালেকশন বা বক্তব্য কোনোটিই শরীয়তসম্মত না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আমার দাদার ভাইয়ের ছেলে মেয়ে, তারা কি আমার মাহরাম? তাদের সাথে কি পর্দা মেনে চলতে হবে? জানালে উপকৃত হতাম।*** *জহিরুল ইসলাম*
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জবাব : না, তারা আপনার জন্য মাহরাম নন। আল-কুরআনে বর্ণিত মাহরামগণের তালিকায় তারা পড়েন না। কাজেই তাদের সামনে আপনাকে পর্দা করে চলতে হবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***আমার এক ভাই গাভি পালেন। তিনি মান্নত করেছিলেন– এবার গাভিটি যে বাচ্চা দেবে, তিনি সে বাচ্চাটি উপযুক্ত হওয়ার পর তার আম্মার পক্ষ থেকে সেটা কুরবানী করবেন। বর্তমানে মান্নতকৃত বাচ্চাটি কুরবানীর উপযুক্ত বয়সে পরিণত হয়েছে, যা আগামী ঈদুল আযহায় কুরবানী করা যাবে। কিন্তু ইতোমধ্যে তার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। এক্ষণে এ পশুটি কি করবেন? কুরবানী করবেন, না কি যবেহ করে গরিব মানুষের মাঝে বন্টন করে দেবেন? আপনাদের কাছে সঠিক সমাধান প্রত্যাশী।***
শাহজাহান আলী
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

জবাব : মান্নত পুরা করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ﴾

"আর তারা যেন তাদের মান্নত পূরা করে!"– *(সূরা আল হাজ্জ : ২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভালো কাজের মান্নত পুরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬২০২)*। তাই আগামী ঈদুল আযহায় মান্নতকারী তার মৃত মায়ের পক্ষ থেকে পশুটি কুরবানী করবেন। আর যেহেতু মা বেঁচে নেই, তাই তা গরিব-মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দেবেন। এটি মৃত মায়ের পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে– *(মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত- শাইখ বিন বায, ১৮/৪০)*। ইন্শা-আল্লাহ তার নিয়ত অনুযায়ী তিনি এর বিনিময় আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবেন।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***বাংলাদেশের হাজীদের মীকাত কোনটি? তারা কি বিমানে জেদ্দা অবতরণ করে সেখান থেকে ইহরাম***

বাঁধবে, না তাদের জন্য নির্ধারিত যে স্থান রয়েছে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে? *ইশতিয়াক চৌধুরী*

উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : বাংলাদেশের হাজীরা পানি জাহাজে গমন করলে তাদের মীকাত হবে ইয়ালামলাম পাহাড়, যা ইয়ামেনে অবস্থিত। আর উড়োজাহাজে সফর করলে তাদের মিকাত হবে কারনুল মানাযিল– যা আইল কাবীর নামে প্রসিদ্ধ (বর্তমান তায়েফ বরাবর)। এই স্থান বরাবর হলেই হাজী সাহেবদের হজ্জে প্রবেশের নিয়ত করতে হবে। অর্থাৎ- এটাই তাদের মিকাত। ইহরাম ছাড়া এটা অতিক্রম করা জায়িয নয়। কেউ বিনা ইহরামে মিকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধতে হবে। নতুবা ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার জন্য একটি দম তথা কুরবানী আবশ্যক। জিদ্দাকে মিকাত মনে করার কোনো দলিল নেই। কাজেই ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর 'আমল করা আদৌ ঠিক না। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৭৩৯; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৫৬; সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮১)*

জিজ্ঞাসা (১২) : *আমি এবার হজ্জে যাচ্ছি –ইন্শা-আল্লাহ। আমি জেনেছি মীকাত থেকে ইহরাম অর্থাৎ- হজ্জের নিয়ত করে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতায় প্রবেশ করতে হয়। এক্ষণে ভুলবশতঃ যদি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে ফেলি, তাহলে আমার হজ্জ হবে কী? জানালে উপকৃত হব।*

আব্দুল মালেক

চৌগাছা, যশোর।

জবাব : মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জে প্রবেশ করা ওয়াজিব। এ মীকাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক নির্ধরিত স্থান– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮১)*। যদি কেউ 'উমরাহ্ বা হজ্জের নিয়তে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তাকে পুনরায় মীকাতে ফিরে এসে ইহরামসহ প্রবেশ করতে হবে। আর যদি কোনো অবস্থাতে মীকাতে ফিরে আসা সম্ভম না হয়, তাহলে মক্কার গরিবদের মধ্যে একটি ছাগল/দুম্বা যবেহ করে বন্টন করে দেবে– *(মু'আত্তা- ১/৪১৯ ও আদ্ দারুকুতনী- ২/২৪৪, সনদ সহীহ)*। এভাবে দম দেয়ার মাধ্যমে হজ্জ সহীহ হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা (১৩) : *আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেন : ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ﴾ "হজ্জের মাসসমূহ জ্ঞাত।" আমার প্রশ্ন– হজ্জের মাস কোন্টি? আর মাসসমূহ জ্ঞাত বলতে আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্য করেছে? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।* *আহমাদুল্লাহ*

ছাগলনাইয়া, ফেনী।

জবাব : হজ্জের মাস বলতে– শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ ও যুলহাজ্জ-এর প্রথমার্ধকে বুঝায়– *(তাফসীরে আত্ তাবারী- ইমাম ইবনু জারীর, ৩৫১৮ পৃ.; ফতহুল বারী- ৩/৪২০)*। আর হজ্জের মাসসমূহ জ্ঞাত বলতে– উপরোক্ত মাস ছাড়া হজ্জ ফর্‌য হয় না –একথা বুঝানো হয়েছে– *(আদ্ দারাকুতনী- ২/২৩৪)*।

জিজ্ঞাসা (১৪) : *আমরা জানি যে, কান কাটা শিং ভাঙ্গা গরু দিয়ে কুরবানী করা জায়িয নয়। তবে কানে সামান্য ফাটা কিংবা শিং-এর অগ্রভাগ আংশিক ভাঙ্গা হলে এ ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী চলবে কি না? দেখা যায় অনেক সময় পছন্দের গরুতে এ ধরনের সামান্য ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়। তাই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনাদের কাছে জানতে চাই।* *তালিবুল ইসলাম*

হালিশহর, চট্টগ্রাম।

জবাব : প্রশ্নে উল্লিখিত সামান্য ত্রুটি কুরবানী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। মূলতঃ কানের বেশিরভাগ কাটা কিংবা শিং বেশি ভাঙ্গা হলে এ রূপ পশু কুরবানীর অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে– *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬৩২; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৫০৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৮০৫; আত্ তামহীদ- ২০/১৭১)*।

জিজ্ঞাসা (১৫) : *আমি এবার হজ্জে যাচ্ছি। আমার একটি সমস্যা আছে, যা বছরে হঠাৎ কখনও দেখা দেয়। আবার এমনও হয় যে, পরপর ২/৩ বছর এমন কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। যখন ঐ অসুখ দেখা দেয়, তখন আমি কোনোভাবে নড়াচড়া করতে পারি না। উপরন্তু আমার জীবন সংকটাপন্ন বলে মনে হয়। যদি আমার এ হজ্জ সফরে ঐ রোগ দেখা দেয়, তাহলে আমি কি করব? দয়া করে জানিয়ে খুশি করবেন।* *মুস্তাক আহমদ*

মদন, নেত্রকোনা।

জবাব : যদি আপনার এই রকম আশংকা থাকে যে, হজ্জ সফরে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেন বা হজ্জ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য শর্তের রূপ হলো– যদি আমি কোনো স্থানে প্রতিবন্ধকতার শিকার হই, তাহলে ঐ স্থানেই হবে আমার ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার স্থান। আপনি আরবীতে বলতে পারেন এভাবে–

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا، فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسَنِيْ.

বাক্যসমষ্টি উচ্চারণ করে কিংবা মনে মনে স্থির করে হজ্জে প্রবেশ করবেন। যদি কোনো স্থানে ঐ সমস্যা দেখা দেয় এবং আপনি অপারগ হয়ে পড়েন, তাহলে ঐ স্থানেই আপনি মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম ছেড়ে দেবেন। আপনার উপর কোনো ক্বাযা করতে হবে না– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৮৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১২০৭)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৩-৩৪ সংখ্যা ❖ ২০ মে- ২০২৪ ঈ. ❖ ১১ যিলক্বদ- ১৪৪৫ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

যমযম কূপ : সৃষ্টির বিস্ময়

–প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

কা'বা ঘরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে হাজরে আসওয়াদ থেকে ৫৪ ফুট দূরে যমযম কূপ। এই অলৌকিক কূপটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে তাওয়াফের স্থানের জন্য। তাওয়াফের পর দু'রাকআত সলাত আদায় করে যমযম পানি পেট ভরে যে নিয়তে পান করবেন সেটা কবুল হবে।[১০৭] এটাও দু'আ কবুলের সময়। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, **যমযমের পানি হচ্ছে খাদ্য ও রোগসমূহের ঔষধ**[১০৮]। আবূ যর গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এক মাস শুধু যমযমের পানি পান করে কাটিয়েছিলেন। একদা রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হজ্জ শেষে যমযমের পানি নিয়ে যেতেন এবং বলতেন যে, রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও ঐ পানি নিয়ে যেতেন[১০৯]। তাওয়াফের সলাত শেষ করে যমযমের পানি পান করতে হয় এবং মাথায় দিতে হয়[১১০]। দাঁড়িয়ে বা বসে ক্বিবলামুখী হয়ে বিস্‌মিল্লা-হ বলে এ পানি পান করবেন এবং দু'আ করবেন। এখানে নিজ ভাষায় এবং আরবি ভাষায় যত ইচ্ছা দু'আ করা যায়। তাওয়াফের সলাত শেষ করে যমযমের পানি পান করতে হয় এবং মাথায় দিতে হয়[১১১]। তবে খেয়াল রাখতে হয় যাতে পানি পড়ে না যায়।

যমযম কূপের পানির বৈশিষ্ট্য : যমযম কূপ সমন্ধে এক পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ারের লিখিত বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা গেল। মঈনুদ্দীন আহমদ রচিত প্রবন্ধটি করাচির ইংরেজী দৈনিক ডন পত্রিকায় ১২.০৭.১৯৯৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে[১১২] এবং তাতে উল্লেখ আছে যে, মিসরীয় এক চিকিৎসক ১৯৭১ সনে ইউরোপীয় পত্রিকায় লিখেছিলেন যমযম কূপের পানি পানের উপযুক্ত নয়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কা'বা সমুদ্র স্তর থেকে নিম্নে এবং মাক্কাহ্ শরীফের মাঝখানে, ফলে শহরের সম্পূর্ণ ময়লা পানি চুয়ে যমযম কূপে গিয়ে জমা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, কা'বা শুধু মাক্কার মধ্যস্থলে নয়, পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। কা'বা ও যমযম হলো মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। জাগতিক দৃষ্টি নিয়ে তা বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

বাদশাহ ফয়সাল সৌদি আরবের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেন যে, ইউরোপের উচ্চমানের ল্যাবরেটরিগুলোতে পরীক্ষার জন্য যমযমের পানি প্রেরণ করা হোক। সৌদি কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন জেদ্দা বিদ্যুৎ ও পানি লবণ মুক্তকরণ সংস্থাকে (Jeddah power and desalination plants)। ইউরোপীয় ল্যাবরেটরিসমূহে যমযম কূপের পানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেয়ার দায়িত্ব ঐ সংস্থার উপর পড়ল।

প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ে যমযম কূপ এলাকায় উপস্থিত হয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কূপটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করলেন। অন্যান্য কূপের মতো যমযম কূপটি গোলাকার নয়। এটা প্রায় ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রের মতো। আর এই কূপটি হতে কোটি কোটি গ্যালন পানি প্রতি বছর হাজীগণ পান করেন এবং স্বদেশে নিয়ে যান। এ ধারা অব্যাহত আছে ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর 'আমল থেকে অর্থাৎ- আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে।

যমযম কূপ পরীক্ষা ও তদন্তকালে কূপটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছাড়াও অন্য দিকগুলো দেখার জন্য একজন লোক গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে যমযম কূপে অবতরণ করলেন। তার শারীরিক উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। সাহস সঞ্চয় করে কূপের মাঝখানে অগ্রসর হলেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কূপের পানির উচ্চতা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত হলো। তাকে নির্দেশ দেয়া হলো কোন জায়গা হতে পানি কূপের মধ্যে আসে, তা খুঁজে বের করার জন্য। যে পরিমাণে পানি উত্তোলন করা হয়, তাতে এ ক্ষুদ্র কূপটি পূর্ণ হতে বহু ধারা বা সুড়ঙ্গ থাকার কথা। তিনি বহু চেষ্টা করেও ছিদ্র বা গর্ত যা দিয়ে পানি কূপে এসে জমা হয়, তা খুঁজে বের করতে পারলেন না।

যমযম কূপ থেকে উপরে পানি সঞ্চয় (স্টোরেজ) ট্যাঙ্কগুলোতে পানি তোলার জন্য কতগুলো পানি উত্তোলন পাম্প লাগানো ছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভাবলেন অধিক শক্তিসম্পন্ন বড়ো আকারে আরো অনেকগুলো পাম্প লাগালে অতি দ্রুত পানি তোলা যাবে এবং কূপটির পানি শুকিয়ে যাবে। সব পানি কিছু সময়ের জন্য পাম্প করে শুকিয়ে ফেলা হলে কোন দিক থেকে পানি আসে তা বুঝা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাম্প করে যমযমের পানি তোলে কূপটি শুকানো গেল না। যতই পানি তোলা হয়, ততই নতুন পানি জমা হয় এবং পানি একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকে। তিনি কূপে নামা লোকদেরকে গভীর মনোযোগের

** সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১০৭] *ইবনু মাজাহ্; আহমাদ; বায়হাক্বী; মুস্তাদরাক হাকিম।*

[১০৮] *সহীহ মুসলিম; সুনান আবূ দাঊদ।*

[১০৯] *জামে' আত্ তিরমিযী।*

[১১০] *মুসনাদ আহমাদ।*

[১১১] *মুসনাদে আহমাদ।*

[১১২] *অনুবাদক : এ. জেড. এম. সামসুল আলম, সাবেক সচিব।*

সাথে লক্ষ্য করতে বললেন, পানি উত্তোলনের সময় কূপের মধ্যে কোনো লক্ষণীয় ঘটনা ঘটে কি-না।

এ প্রক্রিয়া চলাকালে কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি হঠাৎ করে হাত তুলে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি পানির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। তা কোনো ছিদ্র নয়; বরং তিনি যে বালির উপর দাঁড়িয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র বালি কণা মনে হচ্ছিল পায়ের নিচে নৃত্য করছে। তিনি কূপের তলায় বহুবার বিভিন্ন দিকে পদচারণা করলেন এবং পাম্প চলাকালে অনুরূপভাবে পায়ের নিচে বালুকণার নৃত্যভঙ্গি উপলব্ধি করলেন। বস্তুত কূপের তলার সমস্ত অংশে পানি উথলে উঠার গতি সমান বলে মনে হলো। ইঞ্জিনিয়ার পানির স্যাম্পল ইউরোপের বহু ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করলেন। কা'বায় যমযম সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পাদন করে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তিনি কা'বা কর্তৃপক্ষকে মাক্কাহ্ শহরের অপরাপর কূপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা জানালেন যে, অধিকাংশ কূপই ঐ সময় অনেকটা শুষ্ক ছিল। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রিপোর্টটি উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ বললেন, অভ্যন্তরীণভাবে যমযম কূপের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ রয়েছে। লোহিত সাগরের পানি চুইয়ে চুইয়ে যমযম কূপে আসে। সাগরের পানি শেষ হবার নয়। ইঞ্জিনিয়ার মনে নানা প্রশ্ন জাগল, মাক্কাহ্ থেকে জেদ্দার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। যমযম কূপের পানি যদি লোহিত সাগর থেকে আসে, তাহলে জেদ্দা থেকে মাক্কার মধ্যবর্তী স্থানের কূপগুলোতেও কমবেশি পানি থাকবে। মাক্কার পূর্বদিকের কূপগুলোতেও কিছু পানি আসবে। শুধু যমযম কূপেই লোহিত সাগরের পানি আসবে, অন্য কূপগুলোতে আসবে না কেন? যমযমের পানি পরীক্ষার সময় মাক্কাহ্ থেকে জেদ্দা পর্যন্ত এলাকার অধিকাংশ কূপই ছিল শুকনো।

ইউরোপের ল্যাবরেটরি থেকে পানি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেল। সৌদি ল্যাবরেটরিতেও পানি পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছিল। ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং সৌদি রিপোর্ট-এর ফলাফল একই রকম। উভয় রিপোর্টের মধ্য হতে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়, যমযম কূপের পানিতে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সল্টের পরিমাণ মাক্কার অন্যান্য কূপের পানি হতে অপেক্ষাকৃত বেশি। ম্যাগনেশিয়াম সল্ট এবং ক্যালসিয়ামের আধিক্যের কারণেই যমযমের পানি খেয়ে ক্লান্ত হাজীদের ক্লান্তি বিদূরিত হয়। আরও একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যমযমের পানিতে পরিলক্ষিত হলো, এতে আছে অধিকতর ফ্লোরাইড। ফ্লোরাইডের একটি গুণ হলো– সে পানিতে অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো প্রকার জার্ম সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করে। ফলে যমযমের পানি বহুদিন পর্যন্ত রেখে দিলেও পানিতে শেওলা ধরে না এবং পানিতে পোকা জন্মে না। ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে, "যমযমের পানি পানের উপযুক্ত"। মিসরীয় ডাক্তারের যমযম পানি সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যটি গবেষণা প্রসূত ছিল না। এ বিষয়টি বাদশাহ ফয়সালকে অবহিত করা হলো। তিনি প্রীত হলেন এবং যে সমস্ত পত্রিকায় মিসরীয় ডাক্তারের মন্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছিল, সে সমস্ত পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ হতে যমযমের পানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো–

১. যমযম কূপটি কখনো শুকিয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে পানির চাহিদা যত বেড়েছে কূপের পানি সরবরাহও সে অনুপাতে বেড়েছে।

২. যমযম কূপের পানিতে লবণাক্ততা এবং স্বাদ সুদূর অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তেমন আছে। এ পানির স্বাদ একটুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি।

৩. যমযমের পানি পান করার গুণাবলী অতি প্রাচীন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে হাজীগণ হজ্জ ও 'উমরাহ্ উপলক্ষে মাক্কায় এসে যমযমের পানি পান করে থাকেন। কিন্তু কেউ কোনোদিন এ অভিযোগ করেননি যে, যমযমের পানি পান করে তাদের কোনোরূপ অসুবিধা হয়েছে।

৪. এ পানি শেফা বা রোগ নিরাময়ক হিসাবে বিবেচিত।

৫. হাজীগণ যমযমের পানি যত বেশি তাদের পক্ষে সম্ভব পেট ভরে পান করে থাকেন এবং সঙ্গে করে নিয়েও যান।

৬. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পানির স্বাদের পরিবর্তন হয়। কিন্তু যম্যমের পানির স্বাদ অপরিবর্তনীয়।

৭. যমযমের পানি কখনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিশোধনের প্রয়োজন হয়নি।

৮. এ পানিতে ক্লোরিন মেশানো হয়নি বা ক্লোরিন দ্বারা জীবাণু মুক্ত করা হয়নি, যেমন বিভিন্ন নগর জনবহুল এলাকায় সরবরাহকৃত অন্য পানি ক্লোরিনের সাহায্যে পরিশোধিত করা হয়।

৯. পানিতে সাধারণত জলজ উদ্ভিদ, শৈবাল, শেওলা বা ক্ষুদ্র আলজি জন্মে। এমনকি রোগ ও অন্যান্য জীবাণুর জন্ম হয়। কিন্তু যমযমে কখনও রোগজীবাণু জলজ জীবানু বা উদ্ভিদের জন্ম হয়নি।

১০. ফুটন্ত বা পরিশোধিত জীবানু মুক্ত পানি রেখে দিলেও কিছুকাল পর তাতে জলজ উদ্ভিদ বা জীবাণুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু বছরের পর বছর টিন, ক্যান বা বোতলে যমযমের পানি রেখে দিলেও এতে কোনো জীবাণুর সৃষ্টি হয় না।

মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় বিবি হাজেরা (আলাইহাস সালাম) (ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী) ও তদীয় শিশুপুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য যমযমের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। এতে সংমিশ্রিত হয়েছিল মহান আল্লাহর খাস রহমত। যার ফলে যমযমের পানি পেয়েছে এমন সব অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। ❑

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুন-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৮
০২	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৯
০৩	০৩ : ৪৫	০৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৯
০৪	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৩	০৮ : ১০
০৫	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৪	০৮ : ১১
০৬	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৪	০৮ : ১১
০৭	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৪	০৮ : ১২
০৮	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৫	০৮ : ১২
০৯	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৫	০৮ : ১২
১০	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৩
১১	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৩
১২	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৪
১৩	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৪
১৪	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৪
১৫	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১১ : ৫৯	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৫
১৬	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৫
১৭	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৫
১৮	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৬
১৯	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৬
২০	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৬
২১	০৩ : ৪৫	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
২২	০৩ : ৪৫	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৩	০৩ : ৪৬	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৪	০৩ : ৪৬	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৫	০৩ : ৪৬	০৫ : ১৩	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৬	০৩ : ৪৬	০৫ : ১৩	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৭	০৩ : ৪৭	০৫ : ১৩	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
২৮	০৩ : ৪৭	০৫ : ১৪	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
২৯	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৪	১২ : ০২	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
৩০	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৪	১২ : ০৩	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত